দান—পাঁচ টাকা

৭০ তম বর্ষ — দশম সংখ্যা — মাঘ ১৪১৫

"ব্রহ্মচর্য্য সত্যনিষ্ঠা আছয়ে যাহার
সাধনার প্রয়োজন নাহিক তাহার।"

[সত্যের অনুশীলনার্থে শ্রীতারামঠ হইতে প্রকাশিত সত্যসঙ্ঘের মুখপত্র]

সম্পাদক :

সঙ্ঘপ্রাণ শ্রীমৈত্রেয় প্রতিম বড়ুয়া

সূচীপত্র

সঙ্ঘসাথী

"সত্যমন্ত্র হে মানব কর রে গ্রহণ, সত্যই মঙ্গলপ্রসূ শান্তির কারণ।"

সপ্ততিতম বর্ষ মাঘ ১৪১৫ দশম সংখ্যা

সরস্বতী

শ্রীতারাচরণ

শ্বেতবস্ত্র পরিধানা শ্বেত মরাল আসনা
শ্বেতহস্তে শোভিতেছে বীণা।
বাসন্তী পঞ্চমী দিনে অর্চ্চে নরনারীগণে
তব দয়া করিয়া প্রার্থনা।
সরস্বতী বীণা করে শব্দের যোজন করে
অজ্ঞানের জ্ঞানের কারণ।
গুণমুগ্ধ হয়ে যায় নরনারী জ্ঞান পায়
আমোদিত নিখিল ভুবন।
সঙ্গীতে জ্ঞানের আলো বিস্তারিতে যায় কালো
সুধীজন আনন্দে মগন।
বীণাযন্ত্রে গান করে শাস্ত্রের ব্যাখ্যার তরে
প্রিয়পুত্র হয় বহু জন।
শব্দের বন্ধনে তব রচনা তোমার নব
শাস্ত্রে আছে নাম উপাখ্যান।

বিদ্যাবলে নরনারী পশুভাব পরিহরি
সর্ব্বদেশে লভয়ে সম্মান।
বেদ তন্ত্র পুরাণ তব হস্তের লিখন
ব্যাকরণ ভাষা বিবরণ।
যত কিছু মন্ত্র বিজ্ঞান তোমারই বিধান
তব মতে চলিছে ব্যাখ্যান।
কালিদাস বররুচি কবিশ্রেষ্ঠ বাল্মীকি
ভবভূতি তুলসী প্রধান।
তোমার বরেতে তারা গুণমুগ্ধ করে ধরা
তব পদে পাইয়াছে স্থান।
অন্ধজনে চক্ষুদান করিয়াছ জ্ঞানদান
দুঃখ মুছে দাও জ্ঞান বর।
ক্ষুদ্রই মহৎ হয় কৃপাকণা যদি পায়
জ্ঞানালোকে হয় রাজ্যেশ্বর।

সদ্‌গুরু নিগমানন্দ

অনিল চন্দ্র দত্ত (প্রয়াত)

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুতুবপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ভট্টাচার্য বংশে ১১৮৬ সালের ঝুলন পূর্ণিমা তিথিতে স্বীয় মাতুলালয় রাধাকান্তপুরে সদ্‌গুরু নিগমানন্দ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ভুবনমোহন ভট্টাচার্য এবং তাঁহার মাতার নাম মাণিকসুন্দরী দেবী। নিগমানন্দ ১৮ বৎসর বয়সে বিবাহ করেছিলেন। তাঁহার যখন ২৩ বৎসর বয়স, তখন তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার স্ত্রী সুধাংশু বালা দেবীকে বিশেষ ভালবাসতেন। তাঁহার পূর্বাশ্রমের নাম নলিনীকান্ত ভট্টাচার্য। উত্তরকালে তিনি শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

স্ত্রী বিয়োগের পরে পারলৌকিক কয়েকটি ঘটনায় নিগমানন্দ পরলোক বিশ্বাসী হয়েছিলেন। নির্বিকল্প সমাধি ব্যতীত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা যায় না। নির্বিকল্প সমাধি যাঁহার হয়, তাঁহাকেই সদ্‌গুরু বলা হয়। স্বামী নিগমানন্দের নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল, তাই তিনি একজন সদ্‌গুরু।

স্বামী নিগমানন্দের প্রথম গুরু বীরভূম জেলায় অবস্থিত তারাপীঠের সিদ্ধতান্ত্রিক বামাক্ষ্যাপা। বামাক্ষ্যাপার দর্শন লাভের পূর্বে নিগমানন্দ অতি বিস্ময়কর ভাবে একটি বিল্বপত্রে লিখিত একাক্ষরী তারামন্ত্র পেয়েছিলেন। এই একাক্ষরী তারামন্ত্র পাবার কয়েকদিন পূর্বে তাঁর মৃতা স্ত্রীর ছায়ামূর্তি তিনি তিনবার দর্শন করেছিলেন। মৃতা স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দর্শনের পর তিনি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে পরলোক আছে। মৃতা স্ত্রীর ছায়ামূর্তি দর্শনের পর তিনি মৃতা স্ত্রীর সহিত আলাপ করার উদ্দেশ্যেই জগজ্জননীর আরাধনা করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন এবং পরে স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে তারাপীঠে বামাক্ষ্যাপার নিকট উপস্থিত হয়ে বিল্বপত্রে লিখিত মন্ত্রপ্রাপ্তির বিষয় বামাক্ষ্যাপাকে জানালেন।

অতঃপর বামাক্ষ্যাপার অসীম কৃপায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তান্ত্রিক সাধনায়-নিগমানন্দ সিদ্ধিলাভ করেন এবং বামাক্ষ্যাপার অসীম কৃপায় এক শুভক্ষণে একদিন গভীর রাত্রে তারাপীঠের মহাশ্মশানে নিগমানন্দ তাঁর মৃতা স্ত্রীর রূপধারী মা তারার দর্শন লাভ করেন। মা তারা নিগমানন্দকে দর্শন দিয়ে নিগমানন্দকে বর প্রার্থনা করতে আদেশ করলেন এবং বললেন—"ত্রি-লোকে যাহা কিছু অভীষ্ট থাকে বল; আমি তোমাকে সেই সব সম্পদের অধিকারী করব। মৃতাস্ত্রীরূপী জগজ্জননী মা তারার উক্ত কথাগুলি শুনে নিগমানন্দ বললেন—"কি আর চাইব! চাইবার মত কিছু দেখি না—তবে যখনই প্রয়োজন হবে, তোমার যেন দেখা পাই"। নিগমানন্দের উক্ত কথা শুনে, মা তারা হেসে' বললেন—"জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য, ধন, রত্ন, দেবকন্যা, অপ্সরী, বিদ্যাধরী, যোগিনী, রমণী—যাহা কিছু ইচ্ছ করবে—তাই পাবে।" মা তারার উক্ত বাক্যগুলি শ্রবণ করে নিগমানন্দ বললেন—"উহার কোনটাতে আমার বিন্দুমাত্রে প্রয়োজন নাই—আমি তোমাকেই চাই; স্মরণমাত্র ওই মূর্তিতে আবির্ভূতা হবে—দিতে হয়-ত-এই বর দাও"। নিগমানন্দের উক্ত বাক্যগুলি শ্রবণ করে, মা তারা হেসে বললেন—"তাই হ'বে।"

উক্ত ঘটনায় ইহাই বলা যায় যে নিগমানন্দ একজন বীর সাধক ও বড় প্রেমিক ছিলেন। উক্ত ঘটনার পর বামাক্ষ্যাপার নির্দেশেই তিনি জ্ঞানী-গুরুর অনুসন্ধানে তৎপর হলেন এবং অবশেষে রাজপুতনার সাবিত্রী নামক পাহাড়ে নিগমানন্দ জ্ঞানীগুরুর সন্ধান পেলেন। পরমহংস শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ সরস্বতীই নিগমানন্দের জ্ঞানীগুরু।

অতঃপর জ্ঞানীগুরুর নির্দেশেই নিগমানন্দ যোগীগুরুর অনুসন্ধানে নানাদেশে ভ্রমণ করেন এবং অবশেষে তিনি যোগীগুরুর সন্ধান পান। হিমালয়ের গুহাবাসী যোগীরাজ সুমেরুদাসজীই নিগমানন্দের যোগীগুরু। নিগমানন্দ যোগীগুরুর নিকট যোগের বিষয়ে সব কিছুই আয়ত্ত করেন। অতঃপর নিগমানন্দ তীর্থক্ষেত্র পরিভ্রমণকালে একদিন তাঁর জ্ঞানীগুরু সচ্চিদানন্দের সঙ্গে মসুরি পাহাড়ে মহাভাবময়ী গৌরীমার আশ্রমে গিয়েছিলেন। গৌরীমা নিগমানন্দের দিকে একবার বিশেষভাবে দৃষ্টিপাত করে। সচ্চিদানন্দ ঠাকুরকে বলেছিলেন —"অগর তুম্হারা সাগরেৎ কভি নির্বিকল্পমে আ যায়, উস্‌কো মেরা পাস্ ভেজ দেনা।" গৌরীমার এই কথাগুলি নিগমানন্দ শুনেছিলেন। এই গৌরীমাই নিগমানন্দের চতুর্থ গুরু। গৌরীমা নিগমানন্দকে ভাবের ও প্রেমের সাধনায় দীক্ষা দান করেন। নিগমানন্দ তন্ত্র, জ্ঞান, যোগ এবং প্রেমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

বাস্তু প্রসঙ্গ

ডঃ লোকরঞ্জন গুহ

বাস্তুশাস্ত্র এক বহু প্রাচীন শাস্ত্র, যার উল্লেখ প্রাচীন পুরাণেও পাওয়া যায়—অমরকোষ, মৎস্য-পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, অগ্নিপুরাণ, গরুড় পুরাণ, বিষ্ণু পুরাণ—প্রভৃতি সুপ্রাচীন গ্রন্থে এই উৎকৃষ্ট বিদ্যার বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে।

পুরাণাদিতে এই বাস্তুশাস্ত্রের আদি প্রণেতারূপে বিশেষভাবে, দুজনকে প্রতিফলিত করা হয়েছে—দেবতা "ময়" ও "বিশ্বকর্মা" দেবকে। তবু ও প্রকৃতপক্ষে এদের সংখ্যা বৃহত্তর বিচারে অষ্টাদশ। মৎস্য-পুরাণানুসারে ভারতীয় সুপ্রাচীন ঋষি ও দেবতাগণ—তথা ময়, বিশ্বকর্মা ও ভৃগু, অত্রি, বশিষ্ঠ, নারদ, নগ্নজিৎ, বিশালাক্ষ শংকর, পুরন্দর, ইন্দ্র, প্রজাপতি ব্রহ্মা, কুমার, নন্দীশ্বর, শৌনক, গর্গ, অনিরুদ্ধ, শুক্র, বৃহস্পতি—এই অষ্টাদশ ব্যক্তিত্বকে ভারতেই উদ্ভুত বাস্তুশাস্ত্রের উপদেষ্টা বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে বরাহমিহির, কালিদাস, শঙ্করাচার্য্য, নারায়ণ ভট্ট, শ্রীপতি প্রমুখেরাও অনেকে বাস্তুশাস্ত্রের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেন।

এই বাস্তুবিদ্যা যথার্থ ভাবেই বিজ্ঞান ভিত্তিক, যে বিজ্ঞান মহাকাশ রাজ্যেও প্রযোজ্য ও পরিলক্ষিত। সূর্য্য, পৃথিবী প্রভৃতি গ্রহ নক্ষত্রাদি বাস্তুশাস্ত্রের ভিত্তিস্বরূপ। সূর্য্য থেকে সৌর শক্তি প্রাপ্তির দিশা বা দিক্ বলেই, বাস্তুশাস্ত্রে পূব দিকের বিশেষ মাহাত্ম্য বিবেচিত হয়। অন্যভাবে উত্তর দিকের মাহাত্ম্য পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের দিশাকে ভিত্তি করে। এই সকল শক্তিসমূহের প্রভাব যে ধরণী-

ক্ষেত্রে, জীব-জগতে এমনকি মনুষ্য দেহে কার্য্যকরী তা আজ আর কারো অজানা নয়। মনুষ্য দেহও প্রকারান্তরে ঐ তাপীয়, চৌম্বকীয় আলোক শক্তির একদিকে যেমন গ্রাহক (Receptor), অন্যদিকে তাদের আধার স্বরূপ (Container বা Receptacle) তথা Transmitter বা প্রেরক সত্তা। তাই ঐ সকল শক্তি সমূহের গতি, প্রকৃতি, ভারসাম্যতা রক্ষার বিজ্ঞানকে ভিত্তি করেই গড়ে ওঠা এই ভাস্কর শিল্প—এক অনন্য বিদ্যা যা আধুনিক জগতেও সমান সমাদৃত।

ভবিষ্যৎ পুরাণ অনুসারে ভগবান স্বয়ং জলের উপর আর মন্দিরের উপর বসবাস করেন তাই ভগবানের আশ্রয় নিমিত্ত কোন গৃহ রচনা অপ্রয়োজনীয়। আবার, নারদ পুরাণ (পূর্ব) অনুসারে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হন পূর্ব, উত্তর ও ঈশান কোণে বাকী সব ভূমি বা দিশা মনুষ্য লোকের বসবাসের জন্য প্রদত্ত। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ভারতের সবচেয়ে প্রাচুর্য্যশালী তিরুপতি মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা ও স্থাপনা সম্পূর্ণভাবেই ঐ বাস্তু বিজ্ঞান সূত্র সম্মত। এ মন্দিরের কেবল পূর্ব ও উত্তর দিক উন্মুক্ত, পশ্চাতে ও দক্ষিণ প্রেক্ষাপটে কেবলই ব্যাপৃত তিরুমালা পর্বত শ্রেণী। এই মন্দির প্রযুক্তি প্রকল্পে, বায়ু পুরাণানুসারে বহিঃমন্দির নির্মাণ, গরুড় পুরাণ অনুযায়ী অন্তঃমন্দির, বাসগৃহ গঠন ; মানসার মতে স্তম্ভ, প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ, বিশ্বকর্মা প্রকাশ থেকে মূর্ত্তি, প্রাসাদ ব্যবস্থা, সমারঙ্গন সূত্রাধার অনুসারে মন্দির, গৃহসজ্জা ও বৃহৎসংহিতানুসারে ভূমি পরীক্ষা, জরীপ, অঙ্গন, বাগান ব্যাবস্থাপনা আয়োজিত।

সাধারণভাবে, আমরা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে বাস্তুকার বলে থাকি। তবে এই দুইয়ের মধ্যে বাস্তুশাস্ত্রের রয়েছে এক অগ্রণী ভূমিকা। বাস্তুবিজ্ঞান প্রথমেই নির্দেশ দেয়, কিভাবে ভূমি নির্বাচন, গৃহ নির্মাণাদি কার্য্যে অগ্রসর হওয়া যাবে। এটা আজ সর্বজনবিদিত যে, বাস্তু বিজ্ঞান অনুসারে বাড়ী বা অট্টালিকা নির্মাণ করলে তা গৃহে শান্তি, স্বস্তি, সমৃদ্ধি, স্বাস্থ্য লাভের সহায়ক হয়, ঐ উপরোল্লিখিত শক্তি সকল প্রবাহের আনুকুল্যতার প্রভাবে। ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, এই পঞ্চমহাভূত সকল যেমন জীব দেহের উপাদান স্বরূপ ঠিক তেমনি ভাবেই এরা সবাই জগতের উপাদান সমূহ হিসাবে, গৃহ-নির্মাণ গঠনের তথা তাদের সুঠাম ও সুব্যবস্থার, সুরক্ষণাবেক্ষণের জন্য একান্তই আবশ্যক। অন্যদিকে বাস্তু-দোষ যুক্ত গৃহ মানুষের বাসস্থান হিসাবে মোটেই সুখকর নয়, বরং তা বিরুদ্ধাচারী—ঐ সকল পঞ্চভূত ও প্রকৃতির স্বাভাবিক শক্তির প্রতিকুলে বিরোধী অবস্থান হিসাবে। সেই সিদ্ধান্তকে বিচার করেই, জমি কেনা বেচার ও শুভাশুভক্ষণ নির্ণয় যেন বাস্তুবিদ্যারই প্রসারিত এক অঙ্গবিদ্যা, যেমন জমি কেনা বেচার শুভ দিন হল :—৫/৬/১০/১১/১৫ চান্দ্র মাসের দুই পক্ষেই এবং কৃষ্ণপক্ষের ১ম দিন, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার।

বিভিন্ন বর্ণের আলোক-শক্তির বাস্তু-প্রভাব একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভাস্কর-শিল্প বিবেচনা, তবে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তে, সমগ্র গৃহের, ভূমির, আসবাব পত্রের রং-এর খানিকটা পরিবর্তন তথা তাদের প্রভাবের হ্রাস, বৃদ্ধি লক্ষণীয় হয়। যেমন নীল রং দিবালোকেও শীতল থাকে, রাত্রে বরং উত্তপ্ত হয়। অন্যদিকে রামধনুর বিপরীত মেরুতে অবস্থিত লাল রং দিনে উত্তপ্ত ও রাত্রে শীতলতা প্রাপ্ত হয়।

এছাড়াও জমির ভবিষ্যৎ মালিকের রাশিচক্রে ভূমিকারক গ্রহ মঙ্গলের স্থিতি সুদৃঢ় ও শুভ হওয়া একান্ত প্রয়োজন; লগ্নপতিরও বলবান থাকা আবশ্যক। ৯ম ও ১০ম পতির সঙ্গে লগ্নপতির সহায়তা থাকলে বাস্তুক্ষেত্রে অধিক অনুকূলতা লক্ষণীয়। অন্যদিকে চৈনিক শাস্ত্রের প্রাচীন বিদ্যা ফেংশুইও যেন ঐশ্বরিক সহায়তা প্রার্থী, তবে এবিদ্যায় তা মূলতঃ জল ও বায়ু ভিত্তিক, ফেংশুই-এর ধাতুগত অর্থও তাই "জল ও বায়ু"। এর এক কারণ হল, এই প্রাচীন বিদ্যার উৎসক্ষেত্র ছিল, চীনের প্রসিদ্ধ পীলী নদ বা হলুদ নদ। প্রকারান্তরে চৈনিক ফেংশুই বিদ্যা যেন ভারতীয় বাস্তু শাস্ত্রেরই এক আভ্যন্তরীণ রূপ বিশেষ। তাই গৃহের বাহ্য বিচারে যেমন গৃহের দ্বার, অঙ্গন, বসার ঘর, কুয়ো প্রভৃতি নির্মাণ যেমন বাস্তু বিজ্ঞানের বিবেচনাধীন, তেমনই ঐ একই ঐশ্বরিক প্রকৃতি শক্তির আনুকূল্য লাভের উদ্দেশ্যে ব্যবস্থিত জলের ঘটের, ফুলদানীর অবস্থানাদি।

এ দুই বিদ্যাই অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছরের প্রাচীন এবং দুই পুরাতন বৈদিক ও চৈনিক সভ্যতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। তথাপি এদের আধুনিক জগতে প্রাসঙ্গিকতা ও সর্বজনপ্রিয়তা হয়ত একটু যেন চমকপ্রদ। এই সুসংবাদ শ্রীসংকেত নিম্নের বাস্তু প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট। এক, দক্ষিণ ভারতীয় Interior designer কর্তৃক সুদূর মার্কিন মুলুকে বাসগৃহ রচনা ও তাতে সে দেশের সম্মানজনক সরকারী পুরস্কার প্রাপ্তি। দুই—ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রিকেট ক্রীড়াক্ষেত্রে. পর পর পরাজয়ের পর বিজয় লাভের সুমুখ দর্শন হিতার্থে, বাস্তু সম্মত দক্ষিণ দিকের `পরিচর্য্যা ঘরের (Dressing room) ব্যবহারে সাফল্য যা তৎকালীন সংবাদ পত্রের শিরোনামে প্রকাশিত। তিন—বাস্তু অনুকূল প্রাকৃতিক চিকিৎসালয় সুদূর শ্যাম দেশে বা আধুনিক থাইল্যাণ্ডে নির্মিত আবাসে সদ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। চার—পাশ্চাত্যে, কারিগরী শিল্পকলা - কুশলতায় বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রণী মার্কিন দেশে যে সর্বাপেক্ষা বড় কার্য্যালয়ের গঠন প্রকল্পে সুপ্রাচীন বাস্তু বিজ্ঞান সম্মত নির্মাণ পদ্ধতিকে নির্বাচনও যেন এক অতীব চমকপ্রদ সংবাদ বর্তমান ভারতীয় প্রজন্মের কাছে--পাঁচ চিকিৎসা ক্ষেত্রে, মানব শরীরের উপর শক্তির প্রভাব নির্ণয় করতে, যে মাপন যন্ত্র Bio-feed back energy testing system আজকাল রোগের তথা রোগের প্রাদুর্ভাব নির্ণয়ে ব্যাবহৃত হয় সেখানে মূলসূত্র হিসাবে বাস্তু বিজ্ঞানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ছয়—ভারতীয় গান্ধর্ব সঙ্গীত ভিত্তিক চিকিৎসা বিদ্যা (Music Therapy) ও মূলত বিভিন্ন রকমের শব্দ শক্তির দ্বারা মানব দেহে বিভিন্ন বর্ণের ষড়চক্রে প্রভাব বিস্তারকে বিবেচনা করেই ঐ প্রাচীন শাস্ত্র বিদ্যার যেন এক নব সংস্করণ হিসাবে গঠিত। সাত—ঠিক যেমন ভাবে নব গঠিত বর্ণ ভিত্তিক চিকিৎসা বিজ্ঞান (Colour theraphy) পদ্ধতি, সরাসরি প্রাকৃতিক আলোক শক্তিকে রোগ নিরাময়ে কাজে লাগিয়ে, বিশেষ করে লাল রং এর প্রবেশ ঘটিয়ে শরীর মধ্যে রক্তাল্পতার (Anaemia) রোগের চিকিৎসা এযুগে চিকিৎসা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। সূর্য্যের অন্যান্য রামধনু রং এর ও বিভিন্ন রোগ প্রতিকারক ক্ষমতা আছে। যেমন কমলা রং এর দ্বারা ক্ষুধা মান্দ্যের অবসান ঘটানোর

চিকিৎসা, হলুদ রং এর প্রভাবে স্নায়ুর চাপ, ডায়াবেটিস রোগের প্রতিকার, সবুজের স্নিগ্ধতা দ্বারা রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ; কণ্ঠ রোগের প্রতিকারে নীল আলোক রশ্মির প্রভাব এবং মানসিক ভারসাম্য রক্ষার্থে আকাশী বর্ণ ও অল্প নিদ্রার অবসানে তীব্র বেগুনী রশ্মির ব্যবহার।

এছাড়াও আছে পৃথিবীর চৌম্বকীয় ও জল প্রবাহিত ঋণাত্মক শক্তির কুপ্রভাব থেকে জীব ও জগতকে উদ্ধার ব্যবস্থা হিসাবে নির্মিত GEOPATHIC REVERSER নামক ঐ বস্তু ভিত্তিক যন্ত্র যা কিনা প্রকারান্তরে প্রকৃতির ঐ বিভিন্ন ক্ষেত্র যথা চৌম্বকীয়, জলীয়, তাপীয়, সৌর থেকে জাত কোন ঋণাত্মক শক্তিকে ধনাত্মক শক্তিতে রূপান্তরিত করে, তথা মানব বসবাসের অনুকূল করে। অন্যদিকে ফেংশুই বিদ্যাতে এই অনুকূল ধনাত্মক শক্তির অন্য উৎসের সন্ধান পাওয়া যায় কয়েকটি বিশেষ প্রজাতির মৎস্যের মাধ্যমে—যেমন Gold fishes, Flower horn fishes। এতসব কারণে, এক পাশ্চাত্য ভাস্কর-কুশলীর মতে বাস্তু ফেংশুই বিদ্যাদ্বয়ের এক যোগে যথার্থ নামকরণ হল প্রতিবেশ যোগ বা Environ-yoga.

॥ হিন্দী থেকে অনুবাদ ॥

॥ ভুতুড়ে জাহাজ ॥

মূল হিন্দী লেখক—পুষ্পেশ কুমার পুষ্প

বাংলা অনুবাদ—**শ্রীমতী জ্যোৎস্না ঘোষ**

[হিন্দী দৈনিক পত্রিকা 'সন্মার্গ'; কোলকাতা, রবিবার, ১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬ সাল।]

পৃথিবীতে 'কোহিনূর' নামে এক প্রসিদ্ধ হীরে আছে। এর সম্বন্ধে প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে, এটা যখন যার কাছে থাকে—তখনই তার সঙ্গী হয় দুর্ঘটনা, দুর্ভাগ্য এবং বদনাম। পৃথিবীর কিছু কিছু স্থান আর বস্তুর সঙ্গে আক্রোশ আর প্রতিহিংসা পরায়ণ প্রেতাত্মাদের সংযোগ এমন ভয়ংকর ভাবে আছে যে, সেইসব স্থান আর বস্তুর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিগণ অশান্তিতে প্রায় পাগল হয়ে যায়। এই ধরণের একটা জলযান আছে এর ইতিহাস অতি ভয়াবহ এবং এই জাহাজটি বহু মানুষের কষ্ট আর আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিকে আমেরিকার নিউইয়র্ক বন্দরের ৪৪ নম্বর জেটির উপরে 'মেরী সেলিষ্ট্রী' নামক এক জাহাজ দাঁড়িয়েছিল। সেই জাহাজে প্রায় ১৭০০ ডোমর্শিয়ল মদের পিপে তোলা হল। পিপেগুলি পর্তুগালে যাবে। সেই জাহাজের ভিতরে তার ক্যাপ্টেন বেন্জামিন্ স্পুনর ব্রিগ্স্ তাঁর পত্নী যারা ব্রিগ্স্ ও দু'বছরের কন্যা সোফিয়া মিটল্ডা ছিলেন। এঁদের সঙ্গে সাতজন অন্য কর্মচারীও ছিলেন। ঐ জাহাজের মালিক ছিলেন আমেরিকা নিবাসী জেমস্ উইনচেষ্টার।

তৈরী হবার পর থেকেই জাহাজটি অনেক দুর্ভাগ্যজনক ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। এটি ১৮৬১ সালে স্পেন দেশের নোয়া স্কোশিয়া নামক দ্বীপে তৈরী হয়েছিল। তখন এর নাম ছিল 'আমেজোন'। যে ক্যাপটেন 'আমেজোন'কে সর্বপ্রথম সমুদ্রে ভাসিয়েছিলেন. —তাঁর মৃত্যু হল ভাসাবার ৪৮ ঘণ্টার ভিতরেই। নিজের প্রথম যাত্রাতেই এই জাহাজটি 'সায়র্ণের কাছে দুর্ঘটনায় পড়ল এবং জাহাজটির মেরামতির সময়ে এর দ্বিতীয় ক্যাপটেন অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেলেন। এরপর 'ডোভার প্রণালীতে 'মেরী সেলিষ্টী'র সঙ্গে একটা তুমাস্তুল ওয়ালা জাহাজের প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। সেই সংঘর্ষ ঐ দ্বিতীয় জাহাজটিকে সমুদ্রে ডুবিয়ে দিল এবং মেরী সেলিষ্টীর তৃতীয় ক্যাপটেনের মৃত্যু ঘটাল। চতুর্থ যাত্রায় এই ভূতুড়ে জাহাজটি কেপ ব্রিটেন দ্বীপের জমিতে ঢুকে গেল এবং তার ফলে সে আর আস্ত রইল না। যাইহোক, ভাঙাচোরা ঐ জাহাজকে কোনক্রমে জমির বাইরে টেনে আনা হলো। এর মধ্যেই জাহাজটির মালিকানা দু'তিন বার বদল হয়ে গেছে। তারপর মেরী সেলিষ্টী'র মালিক হলেন জেম্‌স্ উইন্‌চেষ্টার।

জেম্‌স উইনচেষ্টার জাহাজটির খুব ভালভাবে মেরামত করিয়ে তাকে প্রায় নতুন অবস্থায় ফিরিয়ে আনলেন। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীরা জাহাজটির যে পুরোন মডেল তৈরী করেছিল—সেটিকে বদলে দেওয়া হল এবং এর পুরোন নামটিও রইল না। এই সময়েই এর 'আমেজোন' নাম বদলে নতুন নাম রাখা হল 'মেরী সেলিষ্টি'। ১৮৭২ সালের ৫ই নভেম্বর ঐ নব কলেবর যুক্ত জাহাজ মেরী সেলিষ্টির প্রথম সমুদ্রযাত্রা করার কথা ছিল। যাত্রা শুরু করার আগে দেখা গেল যে, 'ডিগ্রেসিয়া' নামে আর একটি জাহাজ তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর 'ডিগ্রেসিয়া' নামের জাহাজের ক্যাপটেন এডওয়ার্ড মোর হাউসের সঙ্গে মেরী সেলিষ্টীর ক্যাপটেন বেনজামিন্ স্পুনর একত্র বসে ভোজন করলেন। এর দশ দিন পর 'ডিগ্রেমিয়া'ও সেখান থেকে বহিঃ সমুদ্রের দিকে রওনা হলো। ডিগ্রেমিয়া সমুদ্র বেয়ে চলছে, চলছে। সে পৌছে গেল পর্তুগাল দেশ থেকে প্রায় ৬০০ মাইল দূরবর্তী স্থানে। জায়গাটি ছিল এ্যজোস' আর পর্তুগাল-এর মাঝামাঝি। হঠাৎ ডিগ্রেমিয়ার ক্যাপটেন দূরে সমুদ্রের ভিতরে একটি জাহাজকে দেখতে পেলেন। তাঁর অভিজ্ঞ নাবিক চোখ বুঝতে পারল যে ঐ জাহাজটি বিপদে পড়েছে—সেটি তার নাবিকদের নিয়ন্ত্রণে নেই—এই জন্য সেটি কেমন যেন টাল মাটাল করছে। সমুদ্রে প্রবল ঝড়ও বইছিল। তখন ক্যাপটেন মোর হাউস তাঁর কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে একটি নৌকায় চড়ে ঐ বিপদগ্রস্ত জাহাজের দিকে রওনা হলেন। প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝঞ্ঝায় বাধা পেতে পেতে একটু একটু করে এগোতে হচ্ছিল। দু ঘণ্টার কঠিন পরিশ্রমের পর তাঁরা এমন এক জায়গায় পৌঁছলেন—সেখান থেকে ঐ বেসামাল জাহাজের নামটা পড়া যায়। 'মেরী সেলিষ্টী'ই ছিল সেই জাহাজ। ক্যাপটেন মোর্‌হাউস তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে কোন ক্রমে তাতে উঠে পড়লেন। তাঁরা অবাক হয়ে দেখলেন যে, জাহাজের ভিতরে জীবিত অথবা মৃত—কোন লোকই নেই। অথচ জাহাজের সমস্ত জিনিষপত্র যেখানে যেমন ছিল সব ঠিকঠাক

সাজানো আছে। কেবিনের টেবিলের উপরে অর্ধভূক্ত খাবার পড়ে আছে। পাশে ষ্টোভের উপরে কাঁচা খাদ্য সামগ্রী সাজিয়ে রাখা আছে; বোঝা যাচ্ছে যে, সেগুলি এখনই রান্না করার জন্য গুছিয়ে রেখেছিল কেউ।

ডিগ্রেসিয়ার ক্যাপটেন মোর হাউস মেরী সেলিষ্টির ক্যাপটেন-এর কেবিন থেকে একটি লগ বুক পেলেন ৫ই ডিসেম্বর তারিখে। ঐ লগ বুক-এর লেখা ছিল যে, ২৫শে নভেম্বর সকাল আটটায় মেরী সেলিষ্টী পার হয়ে এসেছে 'সান্তা মেরিয়া' - দ্বীপ সমূহ। এরপর লগ বুক-এ আর কিছু লেখা হয়নি। অর্থাৎ এগারো দিন আগে শেষ নোট লেখা হয়েছিল। মোর হাউস হিসেব করে দেখলেন যে, কোন লোকের সাহায্য ছাড়াই মেরী সেলিষ্টী ৬০০ মাইল সমুদ্রপথ পেরিয়ে এসেছে। এরপর ডিগ্রেসিয়ার নাবিকগণ মিলেমিশে দুটি জাহাজকেই এগিয়ে নিয়ে চললেন। ১২ই ডিসেম্বর তারিখে 'ডিগ্রেসিয়া' জিব্রল্টর প্রণালীতে পৌঁছল এবং পরের দিন সকালে—অর্থাৎ ১৩ই ডিসেম্বর তারিখে সেখানে এল 'মেরী সেলিষ্টী'। মেরী সেলিষ্টী জাহাজটিকে জিব্রালটর-এ আনা হয়েছিল ক্যাপটেন মোর হাউ-সর তত্ত্বাবধানে। এই কারণে তিনি এর সমস্ত জিনিষপত্রের অধিকার দাবী করলেন। তিনি তাঁর এই দাবীপত্র পেশ করলেন জিব্রাল্টর-এর ব্রিটিশ এ্যাডমিরলটি প্রোক্টর এফ সোলী ফ্লাড্ - এর নিকট। তাঁর সেই দাবীর উপর আইনী বিবেচনা করা হতে লাগল এবং এই ব্যাপারে রিপোর্ট এল ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসে। রিপোর্টে বলা হল যে, 'মেরী সেলিষ্টী'র মালিক জেম্স্ উইন চেষ্টার ডিগ্রেসিয়ার ক্যাপটেন মোর হাউসকে মেরী সেলিষ্টি জাহাজ ও তার সমস্ত জিনিষপত্রের মোট দামের এক পঞ্চমাংশ দিতে বাধ্য থাকবেন।

সাড়ে তিন মাস বাদে 'মেরী সেলিষ্টি'তে নতুন ক্যাপটেন এবং বিভিন্ন নতুন কর্মচারী নিয়োগ করা হল। তারা ঐ জাহাজের জিনিষপত্রগুলি জেনেভায় নামিয়ে দিল এবং তারপর জাহাজটিকে নিউইয়র্কে নিয়ে গেল। নিউইয়র্ক পৌঁছনোর পর এর মালিক উইন চেষ্টার মেরী সেলিষ্টিকে তড়িঘড়ি বিক্রী করে দিলেন।

মেরী সেলিষ্টী জাহাজের অশুভ ভাগ্যের কথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ফলে কোন লোক তার ক্যাপটেন হতে চাইছিল না; জাহাজের অন্য কাজগুলি করতেও কেউ রাজী হচ্ছিল না। আরও কয়েকবার এর মালিক বদলে গেল এবং এই সব মালিকদের প্রত্যেককেই কোন না কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হল। অবশেষে ১৮৮৪ সালে গিলম্যান সী পার্কার নামে এক ব্যক্তি মেরী সেলিষ্টীকে ক্রয় করলেন এবং জাহাজের দুর্ভাগ্যের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে বীমা কোম্পানীর দ্বারস্থ হলেন। জাহাজটির বীমা বা Insurance হয়ে গেল।

এরপর মেরী সেলিষ্টী ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ-এর সামুদ্রিক খাড়িতে আবার দুর্ঘটনায় পড়ল। কিন্তু বীমা কোম্পানীর কর্তাদের মনে এই সন্দেহ দানা বাঁধল যে, জাহাজের দাম উসুল করার জন্য ইচ্ছা করে এই দুর্ঘটনা ঘটানো হয়েছে। কোর্ট-এ এই বিষয়ে মামলা চলল। পরে ঐ জাহাজের অদ্ভুত, অস্বাভাবিক পূর্ব ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে জজ সাহেব এর মালিক গিলম্যান সী পার্কার

কে সমস্ত অভিযোগ থেকে মুক্তি দিলেন। এই ঘটনার ৮ মাস পরে পার্কার-এর মৃত্যু হল। ঐ জাহাজের এক কর্মচারী পাগল হয়ে গেল এবং আর একজন কর্মচারী আত্মহত্যা করল। 'মেরী সেলিষ্টি'র মালিক আর তার কর্মচারীদের জীবন কেন যে বারে বারে এই রকম ভয়াবহ ক্ষতি আর দুর্ঘটনার সম্মুখীন হল—তা কেউ জানে না।

মহাভারতের শাশ্বত কথা

শ্রীদেবব্রত দাশ (সাহিত্য শেখর)

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

ভগবদ্ গীতার প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে আমরা সবিশেষ ভাবে লক্ষ্য করি যে, নানা দৃষ্টিকোণ হতে বিখ্যাত মানুষেরা ভারতীয় অধ্যাত্ম শাস্ত্রের এই অনন্য সাধারণ গ্রন্থটির আধ্যাত্মিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ব্যাখ্যা করেছেন অনেকেই প্রাচ্য পাশ্চাত্য শাস্ত্রসমূহ মন্থন করে গীতা প্রতি-প্রাদিত যোগ শাস্ত্রের তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দার্শনিক চিন্তাধারার সঙ্গম গড়ে উঠেছে এই শাস্ত্রগ্রন্থটিকে কেন্দ্র করে।

গীতার বহু ভাষ্যই শঙ্করাচার্যের পূর্বে প্রচলিত ছিল। প্রাচীন ভাষ্যের 'জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়'—জ্ঞান এবং কর্ম—এক সময়ে একই মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠেয় —এই সিদ্ধান্ত নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই শঙ্করাচার্য তাঁর ভাষ্য রচনা করেন। তারপরে সমগ্র পৃথিবীতে বিভিন্ন ভাষায় গীতার ব্যাখ্যা, অনুবাদ, ভাষ্য রচিত হয়েছে, আজো চলেছে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা আমরা বলতে চাই—ভগবদ্গীতার বহুমান্য ভাষ্য, টীকা, ব্যাখ্যা, আলোচনা থাকলেও প্রতিটি ব্যাখ্যাই এক একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ হতে রচিত হয়েছে মহাকবি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব তাঁর অমর রচনা মহাভারতের ভীষ্মপর্বে গীতাকে অন্তর্ভূক্ত করেছেন। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভিক প্রেক্ষাপটে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে লক্ষ্য করে যা বলেছিলেন, সেই বক্তব্যই সূত্রাকারে আঠারোটি অধ্যায়ে ধরা আছে। এই আঠারোটি অধ্যায়—বিষাদযোগ হতে মোক্ষযোগ, যদি 'সূত্র' বা 'তত্ত্ব' বলে মানা হয় তবে তার ব্যবহারিক নিদর্শনটি অবশ্যই মহাভারত। মহাভারতই গীতার সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। স্বয়ং ব্যাসদেবই এই সূত্রসমূহের অসামান্য ব্যাখ্যাকর্তা। মহাভারতের বিভিন্ন পর্বে, আমরা মূলগীতা ভিন্ন আরো তেইশটি গীতার সন্ধান পাই—যার প্রতিটিই মূল ভগবদ্গীতারই সার্থক প্রতিধ্বনি। কেবলমাত্র ভাগবত বিচারেই নয় শব্দ, অর্থ, শ্লোকার্ধ এমনকি সমগ্র শ্লোকের উল্লেখ সেখানে পাওয়া যায়। মূল ভগবদ্গীতাকে, মহাভারত হতে মুছে দিলেও, মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব উপপর্ব হতে সমগ্র গীতাকে পুনরুদ্ধার সম্ভব। এই দৃষ্টান্ত একদিকে যেমন ভগবদ্গীতাকে মহাভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ-হিসেবেই দৃঢ়ভাবে প্রমাণ করে তেমনি মহাভারতই যে গীতার ব্যবহারিক ও অভিজ্ঞতালব্ধ

জ্ঞানের পরিচায়ক সেই দৃষ্টান্তকেও যথার্থ-ভাবে তুলে ধরে। মহাভারতের প্রতিটি চরিত্র, প্রতিটি ঘটনা, আলোচিত জ্ঞানরাশি—সবই গীতার ব্যবহারিক বা পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান। গীতায় আলোচিত তত্ত্বের প্রয়োগ অর্থাৎ সমস্ত দৈনন্দিন জীবনের প্রায়োগিক উদাহরণ-ই মহাভারত গীতাকে যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে হলে নিবিড়ভাবে মহাভারত অনুধ্যানের প্রয়োজন। মহামতি অনন্তলাল ঠাকুর যথার্থ-ই বলেছেন, যিনি মূল মহাভারত পাঠ করেন নি, তিনি গীতার অনধিকার চর্চাকারী।

প্রস্থান কথার অর্থ—'যাত্রা' বা চলা বৈদিক ভাবনায় তিনটি ভিন্ন প্রস্থান রয়েছে। যে তিন উপায়ে বেদান্ত শাস্ত্রকে গভীর ভাবে উপলব্ধি করা যায়, সেই তিনটি প্রস্থানের, তিনটি পথের অন্যতম একটি হল ভগবদ্ গীতা। প্রস্থানত্রয়ীর একটি হল ব্রহ্মসূত্র। বিভিন্ন উপনিষদে আত্মজ্ঞানী ঋষিরা জীব, জগৎ এবং ব্রহ্ম সম্পর্কে, পরম ব্রহ্মের সাধনা সম্পর্কে যা বলেছেন, সে সব গভীর উপদেশের মর্মকথার মীমাংসা করে ব্রহ্ম সম্পর্কিত যে সূত্রসকল বর্ণীত হয়েছে তাই বেদান্ত সূত্র বা ব্রহ্মসূত্র নামে পরিচিত। এখানে সূত্রাকারে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং তাঁর সাথে জীব ও জগতের সম্পর্কের কথা আলোচিত হয়েছে। যুক্তি এবং তর্ক অর্থাৎ ন্যায় বা হেতু শাস্ত্রের মাধ্যমে বেদান্তের বিভিন্ন তত্ত্ব নির্ণীত হয়েছে বলে ব্রহ্মসূত্রকে ন্যায় প্রস্থান বলা হয়।

অপর প্রস্থান—স্বয়ং বেদান্ত। বেদের অন্ত বা পরিশেষ ভাগ। উপনিষদ হচ্ছে বেদান্ত। উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্র দুই-ই আত্মজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছে। আগেই আমরা উল্লেখ করেছি উপনিষদে বহু ঋষি তাঁদের আত্মজ্ঞান-উপলব্ধির কথা বলেছেন। আজ পর্যন্ত দু'শর বেশি উপনিষদের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে। উপনিষদ কথাটি এসেছে 'উপাসৎ' নামক যজ্ঞ হতে। এই যজ্ঞ বা ইষ্টি'র সাহায্যে দেবতারা অসুরদের ত্রিপুর বা তিনটি দুর্গ—পৃথিবীতে লোহার, অন্তরীক্ষে রূপার এবং দ্যুলোকের সোনার দুর্গ ভেঙে দিয়েছিলেন। এই রূপকের অন্তরালে যে সত্য নিহিত, তার অর্থ হলো, দেবশক্তি বা জ্ঞান শক্তি, মানুষের অন্তরে অজ্ঞানের ত্রিস্তর ভেঙে সেখানে প্রজ্ঞানের জ্যোতির বিমল ধারা যে ইষ্টির মাধ্যমে বইয়ে দেন তাই উপসৎ। উপনিষদে সেজন্যই আমরা দেখি আত্মজ্ঞানের সুগভীর এবং বিস্তৃত আলোচনা। স্বয়ং দেবতাই যেন আচার্যের হৃদয়ে আবির্ভূত হয়ে শিষ্যের সমস্ত অন্ধকার নাশ করে দিচ্ছেন। যেহেতু গুরুশিষ্য পরম্পরায় মুখে মুখে এই আত্মবিদ্যার আলোচনা হতো এবং মেধাবী শিষ্য শ্রুতিতে এই তত্ত্বজ্ঞান ধারণ করে গভীর ভাবে মনন করতেন, সেজন্য এই পথের নাম—<u>শ্রুতিপ্রস্থান</u>। শ্রুতির সাধন হলো বোধি। বেদপন্থীদের মতে শ্রুতি অপৌরুষেয়। পূর্বেই আমরা জেনেছি, এই শ্রুতির বিভিন্ন উপদেশের মীমাংসা হতে যে সব সূত্র ন্যায় বা যুক্তি তর্কের মাধ্যমে উপনীত হয়েছে তাই ন্যায় প্রস্থান বা ব্রহ্মসূত্র নামে পরিচিত।

শ্রুতি বা বেদ অপৌরুষেয়—অর্থাৎ কোন ব্যক্তির রচনা নয়। বিভিন্ন ঋষির 'সত্য' জ্ঞানের গভীর উপলব্ধির কথাই এখানে নানা ভাবে বিধৃত রয়েছে। শ্রুতি বা বেদ অপৌরুষেয় কিন্তু ন্যায় এবং স্মৃতি প্রস্থান পৌরুষেয় এবং বেদাঙ্গের

অন্তর্ভুক্ত। শ্রুতি মূলত বোধি—অর্থাৎ অনুভূতি বা উপলব্ধি সাপেক্ষ। এই উপলব্ধি বা অনুভূতি মানুষের মনে চিরকাল স্থায়ী থাকে না। আসে আবার মিলিয়েও যায়। কিন্তু অন্তরে তার স্মৃতি থাকে। এই স্মৃতি হতেই স্মার্ত জ্ঞান। ভগবদ্ গীতা হচ্ছে স্মৃতি প্রস্থান। বেদান্তের তত্ত্ব—'কার্যা-কার্যব্যবস্থিতি'—গীতার মূল বক্তব্য।

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥

১৬/২৪ গীতা।

কর্তব্য এবং অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই একমাত্র একমাত্র উপদেষ্টা বা প্রমাণ। অতএব শাস্ত্র বিধান অবগত হয়ে স্বীয় অধিকারানুসারে কর্মে প্রবৃত্ত হও।

এই বক্তব্য কেবল গীতারই নয়, যে কোন ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রেরই মূল কথা। অন্তর্বোধের প্রসারণ, প্রজ্ঞার বিস্তার যার মাধ্যমে হয় তাই শাস্ত্র। শাস্ত্র হচ্ছে জীবনের নৈতিক বিধান, জীবনের শিল্প। এই নৈতিক বিধান যে কোন জাতির পক্ষেই শ্রেষ্ঠতম আদর্শ। মানুষের সহজাত সংস্কার, এবং বাসনার প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত, প্রশমিত করে মানুষকে আত্মসংযমী, মুক্ত, বুদ্ধিযুক্ত আত্মবোধে উদ্বুদ্ধ এবং অধ্যাত্ম ভাবনায় জারিত করে তোলাই শাস্ত্রের কাজ। গীতার শিক্ষায় আমরা পাই সেই উচ্চতম এবং গুহ্যতম শাস্ত্রকেই, যা আমাদের দেয় অধ্যাত্মভাবে জীবন যাপন করার বিদ্যা এবং প্রয়োগ-নীতি। এই শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষ নিজের রূপান্তর সাধন করতে পারে। এই কারণেই দেশ কাল সময় পার হয়ে সর্ব শ্রেণীর মানুষের জন্যই গীতার শিক্ষা কার্যকরী। পৃথিবীর যে কোন প্রান্তের যে কোন মানুষই তার আত্মিক উন্নতি এবং বিকাশের জন্য গীতার শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারে। বস্তুত বর্ণ-ধর্ম-শ্রেণী নির্বিশেষে যে কোন মানুষই গীতাকে স্ব-সম্পদ বলে দাবী করতে পারে—এখানেই গীতার অপূর্ণতা। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ, যা আমরা গত সংখ্যার আলোচনা করেছি, তার লক্ষ্য সর্বভূতের হিত সাধন—সর্বভূতে সমদৃষ্টি, সর্বভূতে আত্মজ্ঞান এবং সর্বজনের কল্যাণও মৈত্রী ভাবনা। প্রজ্বলিত জ্ঞানময় প্রদীপ স্বরূপ এই স্মৃতি গ্রন্থটি সংসারের সমস্ত মানুষকেই এই লক্ষ্যে নিয়ত উদ্বুদ্ধ করে চলেছে।

বৈদিক ঋষি উপলব্ধি করেছিলেন, আত্মজ্ঞানের মাধ্যমেই মানুষ শোক উত্তীর্ণ হতে পারে—তরতি শোকম্ আত্মবিৎ। আত্মজ্ঞান বা নিবৃত্তিমার্গের প্রাধান্য উপনিষদে যথেষ্ট থাকলেও বংশরক্ষার কথা বা সংসারের গুরুত্বকে উপনিষদ অস্বীকার করে নি। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে—সন্তানধারা বিচ্ছিন্ন করবে না—প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসী। ঈশোপনিষদ স্পষ্ট বলেছে, এই সংসারে যথাবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান করেই শত বৎসর বেঁচে থাকবে। এই ভাবে কর্ম্ম করলে তুমি বন্ধনে আবদ্ধ হবে না এবং এ ছাড়া মানুষের আর কোন বিকল্প উপায়ও নেই—

কুর্বন্নেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥

কেবলমাত্র জ্ঞানকাণ্ডের ওপর নির্ভর করে মানুষ তো চলতে পারে না। এক অনির্দেশ্য অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্মের সাধনা মানুষের পক্ষে সম্ভবও নয়। সে চায় এমন ঈশ্বর যাঁর সাথে প্রাণের যোগ

সম্ভব। যাঁর সাথে অন্তরের প্রীতি এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করা যায়। যাঁকে নিজের মতো করে ভালবাসা যায়, মান-অভিমান করা যায়। সর্বপ্রকার সম্পর্কের বন্ধনে যাঁকে বাঁধা যায়। গীতার মধ্যে মানুষ পেল এমনই এক পুরুষোত্তম-কে, যিনি বিশ্বগত হয়েও বিশ্বাতীত, যিনি একাধারে পিতা, মাতা এবং ধাতা। যিনি সকল প্রাণীর গতি এবং আশ্রয়, প্রভু, সাক্ষী এবং সুহৃৎ। যিনি এই দেহেই অবস্থান করেন পরমাত্মা রূপে, অন্তর্যামী রূপে, নিয়ন্তা রূপে। যাঁকে আমাদের সকল কর্মফল সমর্পণ করেই আমরা কর্ম-বন্ধন হতে মুক্ত হতে পারি, যাঁর কাছে সবাই সমান, কোন ভেদ নেই—সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।

সবচেয়ে বড় কথা, যে পথ একদিন শূদ্রের জন্য নারীর জন্য কষ্টকর ছিল, তারাও এমনকি পাপীরাও 'অনন্যা ভক্তির' দ্বারা ঈশ্বরের আশ্রয় লাভ করে পরম গতি প্রাপ্ত হবে। তাঁকেই জ্ঞানী বলা হয়েছে—যিনি সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন। তিনিই জ্ঞানী, তিনিই ভক্ত। জ্ঞানের সাথে ভক্তির অপূর্ব সমন্বয়ই গীতার আদর্শকে সম্পূর্ণ এবং সার্বজনীন আদর্শ ধর্ম করে তুলেছে। জ্ঞান এবং ভক্তি মিশ্রিত এই ধর্মকে আশ্রয় করে নিষ্কাম বুদ্ধিতে স্বকর্ম সম্পাদন করে সর্বজনের হিতে আত্মনিয়োগের উপদেশই—গীতার মর্মকথা। শুদ্ধজ্ঞান, নিষ্কাম কর্ম এবং অনন্যা ভক্তি এই ত্রয়ীর ত্রিবেণী সঙ্গম সর্বপ্রথম গীতায় পরিদৃষ্ট হয়।

মনে রাখতে হবে ভারতীয় সনাতন ধর্ম কোন সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়। বেদান্ত-ভিত্তিক ভারতীয় ধর্মের মূল বক্তব্যই আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিক আদর্শই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র। ধর্ম যখন আধ্যাত্মিকতা বর্জিত হয়, জ্ঞান এবং নিষ্কাম কর্মের সাধনা হতে সরে আসে তখনই সেই ধর্ম তার প্রাণ হারায়। হয়ে পড়ে দৃষ্টিহীন এবং পঙ্গু। চারপাশে তখন ধর্মের নামে চলে জ্ঞানকর্মহীন তামসিক ভক্তির উন্মাদনা এবং বিকরাল আগর অনুষ্ঠানের প্রাবল্য। সাধারণ মানুষ ভাবে এটাই বুঝি ধর্ম। ফলতঃ দেশ এবং জাতির অধঃপতন শুরু হয়। মানুষ নিজের বিবেক বুদ্ধি মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলে। বীর্যহীন হয়ে পড়ে। সংসার এবং জীবনে দুঃখময় হয়ে সাধারণ মানুষ অদৃষ্টবাদী এবং উদাসীন হয়ে ওঠে। ধর্মের গ্লানি জীবনবোধকে করে তোলে বিপর্যস্ত। তামসিকতায় মানুষের সব শক্তি, উদ্যম এবং আশা ঢেকে যায়।

এই তামসিক ভাব থেকে মানুষকে জাগাতে গীতার বাণী—তোত্রবেত্রেক পাণয়ে চাবুকের মতো কাজ করে। ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ-র মধ্যেই তাঁর প্রথম আঘাত। তার পর প্রতি পদে 'উত্তিষ্ঠিত', 'কৃত নিশ্চয়', যুদ্ধায় বলে বলে জাগিয়ে তোলা। জাগতিক অভ্যুদয়ের জন্য মানুষকে যেমন স্ব-স্ব কর্মে প্রবৃত্ত করতে হবে তেমনি প্রচণ্ড তাড়না হতে তাকে শান্ত করতে হবে লোকহিতের আদর্শের মাধ্যমে। তমস হতে রজোগুণে জাগিয়ে তোলা আবার রজোগুণকে সংযত করতে হবে সাত্ত্বিকতার সাধনার দ্বারা—এই শিক্ষাই গীতা দিয়েছে সমাজকে। জ্ঞান এবং বৌদ্ধিক বিকাশের মতো জাগতিক সমৃদ্ধি আকাঙ্খিত হলেও, হৃদয়ের বিস্তারই প্রকৃত শিক্ষা। যতদিন পর্যন্ত মানুষ এই সত্য উপলব্ধি না করতে পারে যে, সে বিচ্ছিন্ন কোন জীব নয়, সে সমষ্টির অঙ্গ, তার যা কিছু আছে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিতে

হবে, ততদিন তাকে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক হতে উন্নত হতেই হবে। গীতার মধ্যেই রয়েছে কর্ম্মযোগের রহস্য, রয়েছে সাত্বিক কর্ম্মের আদর্শ। গীতাই বেদান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষ্য। এখানেই বলা হয়েছে যিনি সর্ব্বভূতে ঈশ্বরকে সমবস্থিত দেখেন তিনি কখনও অন্যকে হিংসা করেন না। এটিই অদ্বৈতবাদের সর্ব্বপ্রধান কথা। এই আত্মৌপম্য বুদ্ধির মধ্যেই মানুষের জীবনের সদাচারের মূল নীতিটি নিহিত রয়েছে। গীতাকে সেজন্যই বেদান্তের ব্যবহারিক রূপ বলা হয়। গীতার কর্ম্মযোগ শাস্ত্রই প্রকৃতপক্ষে বেদান্তের ব্যবহারিক প্রয়োগ। এই শাস্ত্র গ্রন্থ কেবল সংসার ত্যাগ করে মোক্ষলাভের কথা বলে না। বরং যে কোন ধর্ম্ম - বর্ণ - শ্রেণী নির্বিশেষ সকল মানুষ কেমন ভাবে তাদের বর্তমান অবস্থা হতে উত্তরিত হবেন, মহান হবেন, সম্পূর্ণ হবেন, শোকজয়ী হয়ে আনন্দময় হয়ে উঠবেন এই শিক্ষাই বেদান্ত তথা গীতার শিক্ষা। মানুষের শ্রেয় লাভের উপায়টিই এখানে বলা হয়েছে। আগামী সংখ্যায় আমরা গীতার নীতিতত্ত্ব এবং মহাভারতের দুটি প্রধান চরিত্র বিশ্লেষণ করে তার ব্যবহারিক দিকটির আলোচনা করব। (ক্রমশঃ)

শ্রীমদ্ - ভাগবতসার

প্রণয়কৃষ্ণ গোস্বামী (প্রয়াত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১০/৬ পূতনা বধ

শ্রীশুকদেব বললেন, —নন্দ পথে যেতে যেতেই বসুদেবের কথা মনে করে গোকুলের উৎপাতের বিষয় ভেবে মনে মনে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলেন। এদিকে বালঘাতিনী পূতনাকে কংস পাঠিয়েছে ব্রজের সর্বত্র শিশুহত্যা করবার জন্য। পূতনা তাই করে চলেছে।

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষোঘ্নানি স্বকর্ম্মসু।
কুর্বন্তি সাত্বতাং ভর্তুর্যাতুধান্যশ্চ তত্র হি॥

যে স্থানে সাত্বতপতি ভগবান হরির রক্ষোঘ্ন শ্রবণকীর্তনাদি হয় না সেখানে রাক্ষসীরা উৎপাত করে থাকে।

পুতনা একদিন সুন্দরী তরুণী রূপ ধারণ করে নন্দগৃহে এল। নিশাচরী চুলে ফুলমালা জড়িয়ে এবং আভরণে সুসজ্জিত ছিল। ব্রজবাসীগণ ভাবলেন শ্রীকৃষ্ণ গোকুলে জন্মগ্রহণ করেছেন শুনে হয়তো তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মী মূর্তিমতী হয়ে নিজপতিকে দেখতে এসেছেন। পূতনা বালককে কোলে তুলে নিল। শ্রীকৃষ্ণের দুই জননী যশোদা ও রোহিনী অভিভূত হয়ে পূতনার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাক্ষসী শিশুকে কোলে নিয়েই বিষলিপ্ত স্তন তার মুখে পুরে দিল, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হয়ে দুই হাতে স্তন নিপীড়ন করে রাক্ষসীর সর্বস্ব-প্রাণ ধরে টান দিলেন। পূতনা বার বার 'ছাড় ছাড়' বলতে লাগল। তার দুই চোখ বিকৃত হয়ে গেল, সে হাত পা ছুঁড়তে লাগল, সারা গা ঘামে ভরে গেল, সে কাঁদতে আরম্ভ করল। রাক্ষসী হাত - পা ছড়িয়ে মুখ হা করে মরে পড়ে

রইল। তার প্রকাণ্ড শরীর পড়ে গেলে বারো মাইলের মধ্যে যত গাছ-গাছালি ছিল সব চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। পূতনার ভয়ানক দেহ, পর্বত গুহার মত নাসিকা, চোখ দুটি অন্ধকূপের মত গভীর, জলশূন্য হ্রদের মত উদর। সেই শরীর-দেখে গোপ ও গোপীগণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। গোপীগণ গিয়ে রাক্ষসীর বুকের উপর থেকে গোপালকে তুলে নিয়ে এল।

তারপর পুরনারীগণ গোপালের রক্ষাবন্ধন করলেন, তাঁর কল্যাণ কামনায় নানাবিধ স্ত্রী-আচারাদি করতে লাগলেন। স্নেহপ্রবণ গোপীগণ তাঁর রক্ষা বিষয়ে আধাদি করার পর যশোদা পুত্রকে স্তন্যপান করিয়ে শয্যায় শুইয়ে দিলেন। এই সময়ে নন্দাদি গোপবৃন্দ মথুরা থেকে ব্রজে ফিরে পূতনার বিশাল দেহ দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

কুঠার দিয়ে রাক্ষসীর দেহ টুকরো টুকরো করে তাকে পরে দাহ করা হল। দাহ করার সময় রাক্ষসীর দেহ থেকে চন্দনের গন্ধ এল। শ্রীকৃষ্ণ তার স্তন্য পান করায় তার সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপ সদ্‌গতিম্॥
কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া ভক্ত্যা কৃষ্ণায় পরমাত্মনে।
যচ্ছন্ প্রিয়তমং কিন্নু রক্তাস্তন্মাতরো যথা॥

বালঘাতিনী পূতনা রক্তপায়ী রাক্ষসী, সে হত্যা করবার জন্য ভগবানকে স্তন্যদান করেও সদগতি লাভ করল আর স্নেহশীলা জননীদের মত যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা - ভক্তিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রিয়তম বস্তু দান করে তার সদ্‌গতিতো অবশ্যই হবে।

পূতনার চিতার ধোঁয়া ও সুগন্ধ পেয়ে সকলেই বিস্মিত হল। নানা আলোচনা করতে করতে লোকেরা ব্রজের দিকে এল। গোপালের সব বৃত্তান্ত শুনে তারা আশ্চর্য হল। নন্দ প্রবাস থেকে এসে স্ত্রীপুত্রকে কাছে নিয়ে আদর করে মনে আনন্দ লাভ করলেন। (ক্রমশঃ)

এই যে ধুলো আমার না এ

মনোতোষ দাশগুপ্ত, জ্ঞানব্রত

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মনে গুঞ্জরিত হচ্ছিল 'গুজরা, গুজরা'। এই গুজরা নিয়েই ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০০৮-কে স্বাগত জানালাম। বন্ধ ঘরে ঘড়ি দেখলাম, সাড়ে ছটা। সাতটার আগে গরম জল পাওয়া যাবে। দরজা খুলে বাইরে এলাম। জাফরি-কাটা দেয়ালের ফাঁক দিয়ে সকালের চট্টগ্রাম দেখছি। কে বলবে এটা আমাদের চেতলার সি-আই-টি মার্কেট বা শিলিগুড়ির কলেজ পাড়া নয়? কে যেন বলেছিলেন, সাত-চল্লিশের ১৫ অগাস্ট আমাদের মনটা ভাগ হয়ে গিয়েছে। একভাগ ওপার বাংলায় রেখে, একভাগ নিয়ে এপারে এসেছি।" সত্যি কথা। আজ সাধুবাবার কৃপায় মনের মধ্যে অন্তত এপার বাংলা ওপার বাংলা জুড়ে গেল, ভাঙা মনটা একটু জুড়োলো। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১৮ অক্টোবর, বিজয়া

দশমীর দিনে মাষ্টার মশাই ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবকে স্যর হাম্‌ফ্রেডিভির একটা উক্তির কথা বলেছিলেন : **Divine Truth must be human Truth to be appreciated by us.** (ঈশ্বরের বাণী মানুষের ভিতর দিয়ে না এলে মানুষ বুঝতে পারে না)। ঠাকুর মেনেছিলেন। ঐশী বাসনাও মানুষের মধ্যে দিয়েই আসে, ঐশী করুণাও অনেক সময় মানুষের মধ্য দিয়েই। এই যে ধলঘাট-গুজরা আসা হল সাধুবাবার অপার করুণায়, তা-ও কিছু প্রকাশিত হয় একজন মানুষের মধ্য দিয়েই। আরতিদি (দেব) একবার সাধুতীর্থ পরিক্রমায় বাঙলাদেশে এসেছিলেন। তিনি সমস্তটার ভিডিও ফটো তুলে নিয়ে গিয়েছিলেন। আশ্রমে একদিন রীতিমত অনুষ্ঠান করে সেই ভিডিও ফিল্‌ম্‌ দেখানো হয়। সেটা দেখেই আমরা সংকল্পবদ্ধ হই যে আমরাও যাব সাধুতীর্থে। সাধুবাবাই বোধ হয় আরতিদির মাধ্যমে আমাদের মধ্যে কৃপা ও করুণা 'ইন্‌জেক্ট' (সাধুবাবারই ভাষায়) করে দিয়েছিলেন। আসা হল।

আমাদের গাড়ি এসে গেছে। এত সকালেই! অংশুকণা গরম জল সংগ্রহ করে আনলেন। আগ্রহাতিশয্যে বালতি সিঁড়ি দিয়ে ওপরে নিয়ে এসেছেন। বকাবকি করে বাকিটা পথ আমিই নিয়ে এলাম। স্নানটান করে তৈরি হয়ে নিলাম অল্প সময়ের মধ্যে। চা এল, বিস্কুটও। খেলাম। অংশুকণা ঘরে ঘরে গিয়ে তাগাদা দিচ্ছেন। ওদিকে সুনুও। সাঁড়াশি আক্রমণে সব্বাই প্রস্তুত। নমুদি-সুমিতাও। কিন্তু চলনদাররা আসেন নি এখনো। পাঁচিদি তো ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, গুজরায় তত বেশিক্ষণ থাকা যাবে! ঠিকই তো! কী আর করা! ঘরে বসে টি-ভি সেটটা চালিয়ে দিলাম। খবরের পর সঙ্গীত শিক্ষার আসর হচ্ছে। আর চারদিন পরেই ২১শে ফেব্রুয়ারী—'ভাষা শহীদ দিবস', 'বিশ্ব মাতৃভাষা দিবস'। একজন বললেন পর্দায়, 'কে বলে একুশে ফেব্রুয়ারি শোকের দিবস? এ আমাদের পরম গর্বের দিন, আমাদের ত্যাগ ও আত্মবলিদানই তো বিশ্ব মাতৃভাষা দিবসের জন্ম দিয়েছে।' শিক্ষিকা ছোটদের উদ্দেশে নতুন একটা গানের প্রশিক্ষণ প্রচার করছেন। অমর একুশের অমর গাথা—'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো…'তো রয়েছেই; এটা আরেকটা নতুন গান। প্রতি বছরই এই দিনটিকে কেন্দ্র করে অনেক নতুন গান, কবিতা, ছড়া লেখা হয়। এমনই একটা গান শেখানো হচ্ছে :

"মায়ের আদর ঝরছে যেন
অ আ ক খ থেকে।
বইয়ের পাতায় ক-এর সাথে
কোকিল ওঠে ডেকে।
খ-এর পাশে খরগোসটা
খাড়া রাখে কান,
গ-চলেছে গাঁয়ের পথে
গেয়ে মধুর গান।
খুকুর ডাকে খ-এর দুচোখ
ঘুমে যাবে ঢেকে॥"

এ পর্যন্তই হল প্রথম দিন। সহজ পুনরাবৃত্ত ঘুরে গানটা শিক্ষিকা খুব দরদ দিয়ে শ্রোতাদের শেখালেন। এসে গেলেন সবাই। নেমে এলাম। বাসে উঠলাম। অনুদি কাল ডাক্তার দেখিয়েছেন। ওষুধ কেনা হয়েছে। একটু সুস্থ আছে বললেন। উৎসাহের কিছু কমতি নেই। আজ ধ্রুববাবুর স্ত্রী

এসেছেন। উনি পোর্টের স্কুলে পড়ান। পোর্টের কোয়ার্টার্সেই থাকেন ওঁরা। মেয়েরা আসেনি। ওদের পরীক্ষা। ওদের খাবার ব্যবস্থাদি করতেই একটু দেরী হয়েছে। দুঃখ প্রকাশ করলেন। আজ একজন নতুন সহযাত্রী পেলাম। আমার পাশেই বসলেন। নাম সন্তোষ কুমার দেওয়ানজী, ইস্পাহানী স্কুলের অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক। ওঁর স্ত্রীও এসেছেন, উনি বসলেন আমাদের পিছনের আসনে। বাস ছাড়ল, আজ একটু দেরীই হল। রাস্তায় আবার থামল ফলফলাদি, ফুলটুল কেনার জন্য। যাহোক চললাম। আগের দিনের মতই সব প্রতিষ্ঠান গুলির পাশ দিয়ে চলেছি। শ্রী দেওয়ানজী প্রায় ধারাবিবরণীর ঢঙে পরিচিতি দিয়ে যাচ্ছেন। চট্টগ্রাম শহর নিগম (চিটাগাং সিটি কর্পোরেশন) এর সামনেই দেখলাম আমানাত্ শাহ্-বদর শাহের দরগা ও স্মৃতিস্তম্ভ। অনেক দিন আগে এঁরা চট্টগ্রামে (তখন চট্টগ্রাম নাম হয়নি) এসে ধুনি জ্বালিয়েছিলেন। মানববর্জিত এই জনপদ ছিল জিন্ আর ভূতপেত্নী-আত্মার আবাসস্থল। দূরগ্রামের আদিবাসীরা বন আর টিলায় সমাচ্ছন্ন এ জায়গায় আসত না। ফকীর দুজন রোজ সন্ধ্যায় বাতি জ্বালাতেন। বিদেহী আত্মারা এই পূত আলোক সহ্য করতে পারত না। বহু চেষ্টা করেছে ওরা ওই দরবেশদের মারতে বা ক্ষতি করতে। কিন্তু সত্যের সঙ্গে মিথ্যা পেরে উঠবে কেন? কুর্‌আনেই আছে, "বল, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে" (১৭/৮১)। শত চেষ্টা করে জিনেরা চিরাগ নেভাতে পারেনি। শেষে পরাস্ত হয়ে রণে ভঙ্গ দিল। শাহ্ ফকীর ভায়েরা ওখানেই থাকতে লাগলেন। ওদের অলৌকিক ক্ষমতায় আকৃষ্ট হয়ে মানুষ জমা হতে লাগল। বন কেটে বসত হল। এক সময়কার টিলা পরবর্তীকালে কেটে সমতল করা হল। গড়ে উঠল এক সমৃদ্ধ জনপদ। প্রদীপ বা চিরাগকে চাটি (সাটি)-ও বলা হয়। ওই 'চাটি' থেকে এসেছে 'চট্টগ্রাম' নাম। এখনও মানুষ ওই কিংবদন্তীতে বিশ্বাস করে এখানে চিরাগ জ্বালায়। একটা বিরাট 'শপিং মল' পড়ল রাস্তায়—নামটা সুন্দর, 'কেয়ারী ইলিশিয়া'। যেতে যেতে বাঁদিকে পড়ল 'শহীদ জিয়া মিউজিয়াম'। এর চত্বরে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খৃষ্টান—সব ধর্মের মন্দির আছে; আছে নমুনা 'স্বাধীনতা স্মারক'-ও। বিরাট এলাকা নিয়ে এটি গড়ে উঠেছে বি-এন্-পি সরকারের আমলে। 'সারজা রাস্তার মাথা'-য় পেলাম 'কাপ্তাই হাইড্রো ইলেক্ট্রিসিটি প্রজেক্ট'। তারপর চান্দগাঁও। অসমের লুসাই পাহাড় থেকে বয়ে আসা জলে কাপ্তাই প্রজেক্ট গড়ে উঠেছে। এরপর হাল্‌দা নদী পার হলাম ঠিক বেলা সাড়ে এগারটায়। এই হাল্‌দা নদীর গুজরার অংশে আছে মৎস্যজীবীদের আবাস। হাজার হাজার লোক এই জীবিকায়। এর একটা ভৌগালিক কারণ আছে। প্রত্যেক বছরেই কাল বৈশাখীতে গুজরার কাছে হালদা নদী মোহানায় চারদিকে মাছ এসে জড়ো হয়—পোনা ছাড়ে। ধ্রুববাবুর স্ত্রী কর্ণফুলি পার হবার সময় নদীটিকে নিয়ে রচিত একটি লোকসঙ্গীতের কয়টি কলি শোনালেন, "লুসাই পাহাড় থুন্ নামিয়া যাস্ কই কর্ণফুলি...." হঠাৎ-ই একসময় ধ্রুববাবু বলে উঠলেন এই তো গুজরার রাস্তায় পড়লাম। বাঁদিকে বিরাট তোরণ—দরবারে কামেলিয়ার। সেই গেটের মধ্য দিয়ে বাস চলল। আরও কয়েকটি এরকম স্থান নজরে পড়ল। একটি যেমন দরবারে

আজিজিয়া। সাধুবাবা জন্মেইছিলেন সর্বধর্মসমন্বয়ের এক আখড়ায়। খানিকটা এগিয়ে কানে এল মাইকে মাতৃসঙ্গীত। আমাদের গাড়িতেও শুরু হয়েছে সমবেত গুরুকীর্তন। হাতে মা-বাবার ছবি নিয়ে সবাই লাইন করে ঢুকলাম গুজরার পুতাস্থি মন্দিরে। মেয়েরা শাঁখ বাজাল, জোকার (হুলুধ্বনি) দিল, ফুল ছড়াল, হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিল। আবার উদ্বেলিত হৃদয়ে সজল চক্ষে মন্দির প্রদক্ষিণ করলাম। ঢুকলাম মন্দিরগুলিতে একে একে। প্রথমেই অমলেশ্বর শিব মন্দির। দুটি শিবলিঙ্গ পাশাপাশি। ডানদিকে শ্বেতলিঙ্গ আর বাঁদিকে কৃষ্ণলিঙ্গ। এঁদের দুইদিকে উপবিষ্ট বৃষমূর্তি। ডানদিকেরটি সবুজবর্ণের অন্যটি কালো। এর পরে শ্যামবর্ণা—কৈলাসেশ্বরীর শ্যামা মূর্তি। পরে জেনেছি এ মূর্তি নাকি আগে কালী মূর্তি ছিল। সেই মূর্তিরই আদল কলকাতার তারা মঠের মাতৃমূর্তি। ১৯৯২ সালে বাবরী মসজিদ ভাঙার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ বাংলাদেশে যে হাঙ্গামা হয় তাতে এই মূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তারপর নূতন মূর্তি গড়তে গিয়ে কীভাবে যেন শিল্পী শ্যামা মূর্তি করে ফেলেন। অপূর্ব সুন্দর মূর্তি। অপূর্ব মাতৃভাব যেন ঝরে পড়ছে। লোলরসনা, করালবদনার ধারণাই আসেনা। যেন গাঁয়ের বধূ অবাক হয়ে জিভ কেটেছে। লাল টুকটুকে ঠোঁট ঘিরে রেখেছে লাল টুকটুকে জিভ। সুন্দর বেদীর উপর বসানো। পূজো শুরু হয়নি। হবে। সুচারুভাবে পুজোপকরণ সাজানো। পাশের প্রকোষ্ঠে পাশাপাশি প্রতিষ্ঠিত সাধুবাবা ও সাধুমায়ের উপবিষ্ট প্রস্তরমূর্তি। মূর্তিদুটি রঙিন—অর্থাৎ চোখ কালো, চুল কালো, ঠোঁট লাল —এমন আর কী। এখানেও মার মূর্তি বাবার মূর্তির ডান দিকে। স্থানীয় শিল্পীর তৈরী মূর্তি। শিল্প-সুষমার দিক থেকে অনবদ্য না হলেও শিল্পীর নিজের একটা ভাবনা আছে। বিশেষ করে সাধুবাবার মূর্তির মধ্যে একটা লীলায়িত ভঙ্গী আছে। অনেকটা সাধুবাবার গৌরাঙ্গ মূর্তির মত মাথাটা হেলানো। তবে গৌরাঙ্গ মূর্তির মাথা বাঁদিকে হেলানো, এখানে ডানদিকে। বড় ভালো লাগল মূর্তিটি সাধুবাবার হাসিমুখের বলে। ধ্রুবপ্রিয়বাবু বলছিলেন, "আমরা তো সাধুবাবাকে, সাধুমাকে দেখিনি। ওই ছবি দেখে, কথা শুনে যেভাবে ভেবেছি, শিল্পীকে বুঝিয়েছি, শিল্পী তার সঙ্গে নিজের ভাবনা মিশিয়ে এই মূর্তি করেছে।" তাতে কী হয়েছে? 'সেই সত্য যা রচিবে তুমি-' বিভিন্ন শিল্পকলায় সারা পৃথিবীতে যে অজস্র বুদ্ধমূর্তি—কে বলবে কোনটা সবচেয়ে বাস্তবানুগ? রামকিঙ্কর যে রবীন্দ্রনাথের ভাস্কর্য গড়েছেন, সেটা দেখে তো অনেকে বুঝতেই পারেন নি যে ওটা রবীন্দ্রনাথের; অনেকে তো আবার 'শকুড়'-ও হয়েছিলেন। শিল্পী মূর্তি গড়েন 'যেমন দেখছি বা দেখেছি' আর, 'যেমন ভেবেছি' ধরে। ভাবনা শিল্পীতে শিল্পীতে পার্থক্য তো হবেই। তাছাড়া আমাদের ঠাকুর তো মাটির ঠাকুর, গ্রামের মানুষ থেকে নগরের মানুষের ঠাকুর! গ্রামীণ শিল্পীর কল্পনা খারাপ হতে যাবে কোন দুঃখে? মার মূর্তির মুখখানি ঢলোঢলো। লাল টিপ পড়া মুখটি বেশ! চোখ দুটি একটু বড়ো—এতটা বড় চোখ মার ছিল না। ছিল না তো ছিল না! শিল্পী যদি আমাদের ব্রহ্মময়ী মাকে ব্রহ্মপুরুষের সঙ্গে অভিন্ন মনে করে —যে পুরুষকে উপনিষৎ বর্ণনা করছেন "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। / স ভূমিং বিশ্বতো

বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্ ॥" (পূর্ণ পুরুষের অসংখ্য মাথা, চোখ ও পা ; তিনি সব দিক থেকে জগতে ব্যাপ্ত থেকে নাভিমূলের দশ অঙ্গুলি পরিমাণ দূরত্বে অর্থাৎ হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকেন, শ্বেতাশ্বতর, ৪৭) —আয়ত চক্ষু ক'রে মূর্তি গড়েন, আমি তো দোষ দেখিনা। মূর্তি দুটি যে লালাভ পাথরের পদ্মবেদীতে স্থাপিত তা অতি সুন্দর। তবে মূর্তির বেদীতে নামাঙ্কন না করলেই ভালো হত। এটা শিল্পোচিত নয়।

(ক্রমশঃ)

কান্ত কবি শান্ত কেন

শ্রীঅরুণ কুমার সেনগুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

কান্ত কবি হাসপাতালে রোগ শয্যায় শুয়ে বিস্ময়করভাবে এক অসাধারণ হিন্দী গান রচনা করেন।

আরে মনোয়া রে, কর লে অভি
দরিয়া-বিচ্‌মে নঙ্গর ;
দিন্ রাত্ ভর্ কিস্তি চলায়া,
মিলায়া নে কৈ বন্দর্।
আরে জ্ঞান-ভক্তি দোনো ধারা বহে,
কহে বেদ-তন্তর্,
তুমকো নয়া রাস্তা কোন্ বতায়া,
কোন্ দিয়া তুমকো মন্তর ?
কিস্তি ভরুকে লিয়া কিত্‌না
লাখ রুপয়া হন্দর,
সব জমাকে বহুৎ ভুখা হো,
অভি জ্বলতা অন্দর।
আরে খেয়াল্ কর্ লে দাঁড় হাল্ সব্
বরাত হুয়া যন্তর্,
ভিনো বরখা পার হুয়া, অউর্
ফুটা হুয়া অন্তর।
আরে ডুবনে লগা কিস্তি
পানিমে হৈয়ে হাঙ্গর,
কিংনা ফুটা বন্দ্ করোগে—
মুহ্‌মে বোলো শিউ শংকর।

কান্ত কবি সংসারের মায়া মোহ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করতেন। এ সময় তিনি লিখেছেন গান :

সে বসল কি না বসল তোমার শিয়রে,—
তুমি, মাঝে মাঝে মাথা তুলে,
সেই খবরটা নিয়ো রে।
(ও সে বসল কি না)
সে তো তোমার সাথেই ছিল ;
কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দিল।
তোমার ন্যায্য পাওনা
বাকি নাই একটিও রে ;
একটু পায়ের ধুলো বাকি আছে,
একবার মাথায় দিয়ো রে ;
(এই যাবার বেলায়)
চাও নি তারে একটি দিন,
আজ হয়েছ দীন হীন।
সে ছাড়া, আর সবাই ছিল প্রিয়রে,

আর থাস্‌নে রে বিষ পায়ে ধরি,
(তার) প্রেম সুধা পিওরে।
(দিন ফুরাল)।

মা আনন্দময়ীর দর্শন লাভের পর মায়ের আনন্দে কান্ত কবি রজনীকান্ত লিখলেন :

ওগো, মা আমার আনন্দময়ী,
পিতা চিদানন্দময় :
সদানন্দে থাকেন যথা,—
সে যে সদানন্দলয় ;
সেথা আনন্দ-শিশির পানে
আনন্দ রবির করে।
আনন্দ কুসুম ফুটি,
আনন্দ-গন্ধ বিতরে।
আনন্দ-সমীর লুটি,
আনন্দ-সুগন্ধ-রাশি,
বহে মন্দ, কি আনন্দ-পায়
আনন্দ পুরবাসী।
সন্তান আনন্দ-চিতে।
বিমুগ্ধ আনন্দ গীতে।
আনন্দে অবশ হয়ে
পদ-যুগে পড়ে রয়।
আনন্দে আনন্দময়ী
শুনি সে আনন্দ-গান
সন্তানে আনন্দ-সুধা
আনন্দে করান পান ;
ধরণীর ধুলো মাটি
পাপ তাপ রোগ শোক—
সেখানে জানে না কেহ
সে যে চিরানন্দ লোক।
লইতে আনন্দ-কোলে,
মা ডাকে 'আয় বাছা' বলে
তাই, আনন্দে চলেছি ভাইরে,
কিসের মরণ-ভয় ?"

বাংলা ১৩১৬ সাল। জ্যৈষ্ঠ মাস। কান্ত কবি রাজশাহীতে একদিন পান চিবোচ্ছিলেন। হয়ত পানে বেশী চুন দেওয়া হয়েছিল। তাঁর মুখ পুড়ে যায়। কান্ত কবি সঙ্গে সঙ্গে মুখ থেকে পান ফেলে দিয়ে মুখ ধুলেন। তিন দিন পরে তাঁর গলায় ব্যথা হয়। ডাক্তারদের দেখান হয়। ওষুধ দেওয়া হয়। ডাক্তাররা বলেন, ভয়ের কিছু নেই।

কান্ত কবিকে (রজনী কান্ত সেন) রঙপুরে যেতে হয়। তিনি অতুল চন্দ্র গুপ্ত এম·এ·বি·এল মশায়ের বাড়ীতে থাকেন। তিনি যেদিন রঙ্গপুরে পৌঁছলেন। সেদিন রাত বারটা পর্যন্ত তিনি হারমোনিয়াম নিয়ে গান করেন। পরের দিন বিভিন্ন মানুষের অনুরোধে সরকারী উকীল রায় বাহাদুর ব্রজেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সন্ধ্যে থেকে রাত প্রায় দেড়টা পর্যন্ত গান গেয়ে শোনান। দুশো লোক সেদিন ওই বাড়ীতে হাজির ছিলেন।

কান্ত কবি রঙ্গপুর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর গলা ভেঙ্গে গেল। গলা দিয়ে ভাল স্বর বেরোতে পারে না। গলার ব্যথা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। ওষুধ চলতে থাকল কিন্তু রোগ কমল না, ব্যথা কমল না। আত্মীয়রা তখন ভাবলেন, রজনী কান্ত বোধ হয় মারাত্মক ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

কান্ত কবি রোগ যন্ত্রণা সব উপেক্ষা করে প্রতিদিন কাছারী যেতেন। মামলার সওয়াল জবাব করতেন। কিন্তু বিকেলে বাসায় ফিরে তিনি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়তেন। তিনি ভাল করে

কথা পর্যন্ত বলতে পারতেন না। তাঁর গলার স্বর বদলে গেল। তাঁর খেতে কষ্ট হতে লাগল। গলায় ঘা হল। কবি তার ডায়েরীতে ১০ই মার্চ তারিখে লিখেছেন। হঠাৎ হাসতে হাসতে গলায় ঘা হল, তাই নিয়ে রংপুরে গিয়ে তিন দিন গান করতে হল। তারপর থেকেই এই দশা।

কান্ত কবি ২৬শে মার্চ তারিখে লিখেছেন, প্রথম কথাটা তোদের মনেই থাকে না। জ্যৈষ্ঠ মাসে পান খেয়ে মুখ পুড়ে, তারপর জিভের বাঁ ধার দিয়ে মটরের মত গুড়ি গুড়ি হয় ও বেদনা, গাল ফুলে। ক্রমে সেই যন্ত্রণা বাড়ে; ক্রমে তা থেকে ঘা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। গলনালী আর শ্বাসনালী দুটো জিনিষ আছে। আমার ভাত খাবার নালীর মধ্যে ঘা নয়। নিঃশ্বাসের নালীর মধ্যে ঘা, সেখানে কোনও ঔষধ লাগান যায় না। এই সময়ে জিভের মধ্যে বাঁ পাশ দিয়ে বরাবর ছোট ছোট মটরের মত গোটা, ব্যারামের সূত্রপাত থেকেই আছে।

কান্ত কবির যখন গলায় অসুখ করে তখন তাঁর ভগিনী ক্ষীরোদবাসিনী দেবী রাজশাহীতে তাঁর জন্য কিছু ভাল ছাঁচি পান আর উৎকৃষ্ট চিড়া পাঠান। কান্ত কবি ক্ষীরোদবাসিনী দেবীকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

ভগিনী, তোমার প্রেরিত পান ও চিড়া পাইলাম। উহারা আমার অতি প্রিয় হইলেও পরিত্যাজ্য। কারণ চিকিৎসকগণ আমাকে ঐ দ্রব্য খাইতে নিষেধ করিয়াছেন। কয়েকদিন হইল আমার গলার ভিতর একটু ঘা দেখা দিয়াছে। ডাক্তারেরা ঠিক বলিতে পারিতেছেন না উহা কি রোগ। যদি ক্যানসার হয়, তবে সত্বরই তোমাদের মায়া কাটাইতে পারিব।

বাংলা ১৩১৬ সালের ২৬শে ভাদ্র। রজনীকান্ত অসুখ ভীষণ বেড়ে যাওয়ায় পরিবারের লোক-জনের সঙ্গে কলকাতা যাত্রা করেন। রাজশাহী থেকে এই তাঁর শেষ যাত্রা। পৃথিবীর শ্যামল মাটি থেকে বিদায়ের ঘন্টা বেজে গেছে। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য, এমন সুন্দর একটা ফুল অকালে ঝরে যাবে।

কান্ত কবি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। যন্ত্রণা খুব বেড়ে গেল। একদিন যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে একজনকে লিখেছিলেন, তোরা আমাকে রাজশাহী নিয়ে যা। আমি সেইখানে মরব। কান্তকবি রাজশাহীর কোন লোককে দেখলে বড় খুশী হতেন।

সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত কটক থেকে কলকাতায় বদলী হয়ে ৩৭ নম্বর সারপেনটাইন লেনে বাস করেছিলেন। তিনি কান্ত কবিকে নিজের বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানালেন। কবি সপরিবারে এই বাড়ীতেই উঠলেন।

ডাক্তার ওকেনেলি সাহেব কান্তকবিকে দেখলেন। তিনি খুব যত্ন করে নানাভাবে পরীক্ষা করে সুনিশ্চিত হলেন, রোগটি ক্যানসার। কান্তকবি ডাক্তারের মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারলেন, তাঁর বিদায় আসন্ন। তিনি ডাক্তারকে ইংরেজীতে প্রশ্ন করেন, রোগটা কি ক্যানসার? এটা কি মারাত্মক? ডাক্তার বাধ্য হয়ে বললেন, 'মারাত্মক' বলতে পারি না, তেমনি 'মারাত্মক নয়' একথাও বলা যাবে না।

ডাক্তার ওকেনেলি সাহেব চিকিৎসার দায়িত্ব নিলেন। তিনি দুবার পরীক্ষা করলেন, বিভিন্ন ওষুধ দিলেন কিন্তু রোগের যন্ত্রণা এতটুকু কমল

না। কলকাতার সেরা সেরা ডাক্তাররা কবিকে দেখলেন কিন্তু সমস্যার কোন সমাধান হল না।

বালাজি মহারাজ নামে একজন অবধূত চিকিৎসক ছিলেন কাশীধামে। রজনীকান্তের বাল্যবন্ধু সরকারী উকীল রাধিকা মোহন সেনের রোগ সারিয়ে দেন মহারাজ। রজনীকান্ত বললেন, কলকাতায় কিছু হবে না। কাশীধামে নিয়ে চল। বিশ্বনাথের কৃপায় যা হয় হবে। আমি বালাজি অবধূতের চিকিৎসায় থাকতে চাই। কাশী যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে গেল।

কান্তকবি রজনীকান্ত কার্তিক মাসে সপরিবারে কাশী যাত্রা করেন। এদিকে অর্থাভাব। কান্তকবি 'বাণী' আর কল্যাণীর গ্রন্থস্বত্ব অবিক্রীত দুশো বই মাত্র চারশো টাকায় বিক্রী করতে বাধ্য হলেন। কান্তকবি এই দুই অমূল্য রত্ন জলের দরে বিক্রী করে যে মর্মান্তিক যন্ত্রণা ভোগ করে ছিলেন, তিনি এসব মানসিক বেদনার কথা ডায়েরীতে লিখে গেছেন—আমার এমন অবস্থা হল যে, আর চিকিৎসা চলে না। তাইতো বড় আদরের জিনিষ বিক্রয় করেছি। হরিশ্চন্দ্র যেমন শৈব্যা ও রোহিতাশ্বকে বিক্রয় করেছিলেন। হাতে টাকা নিয়ে আমার চক্ষু দিয়া জল পড়িতেছিল। আর ত তেমন মাথা নাই। আর ত লিখতে পারব না। যদি বাঁচি জড় পদার্থ হয়ে রইলাম।

কান্ত কবি কাশীতে রামপুরায় একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে প্রথমে থাকেন। এরপর স্বামীজীর পরামর্শে গঙ্গার ধারে মানমন্দিরের কাছে এক বাড়ীতে থাকেন। সবশেষে তিনি কাকিনারাজের বাড়ীতে থাকেন। কান্ত কবি আত্মীয়দের পরামর্শে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করেন কিন্তু কোন সুফল হল না। তাকে কঠিন শ্বাসকষ্ট ভোগ করতে হয়।

বালাজি মহারাজ কার্তিক মাসের শেষ থেকে কান্ত কবির চিকিৎসা সুরু করেন। বালাজির নির্দেশে কান্ত কবি প্রতিদিন সকালে গঙ্গাস্নান করতেন। এই ব্যবস্থা শুনে সকলে অবাক হন। সুদীর্ঘকাল কান্ত কবি স্নান করেন নি। আত্মীয়রা যখন এই ব্যবস্থা মেনে নিতে পারছিলেন না, তখন কান্তকবি বলেন, ভয় করো না। দেখ আমার আর কোন অসুখ হবে না। কান্ত কবি নিশ্চিত ছিলেন, স্বামীজীর চিকিৎসায় তিনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। প্রতিদিন গঙ্গা স্নান করে স্বামীজীর দেওয়া ঔষধ সেবনে কান্তকবি অনেকটা সুস্থ বোধ করতে থাকেন।

কান্ত কবি প্রতিদিন খুশী মনে বিভিন্ন দেবদেবী দর্শন করতেন. তিনি হেঁটে, পালকীতে চড়ে বিভিন্ন মন্দিরে যেতেন। তাঁর মনে অনেক উৎসাহ বেড়ে যায়। তিনি বিকেলে নৌকায় বেড়াতে বেরোতেন। যদিও এসময় জ্বর হত, গলা দিয়ে রক্ত পড়ত, তবু তিনি অনেকটা সুস্থ হন। কিন্তু মাঘ মাসের প্রথমে তাঁর রোগ বেড়ে গেল। গলা ফুলে গেল। বালাজির ওষুধ ব্যর্থ হল। কান্ত কবি এক ফকীরের ওষুধও সেবন করেন। কিন্তু সব ব্যর্থ হল। শ্বাস কষ্ট বাড়ল। অনেকে একবার আগ্রায় গিয়ে রেডিয়াম চিকিৎসা করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তার যন্ত্রণা, শ্বাসকষ্ট এত বেড়ে গেল যে তাঁকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনা হল।

(ক্রমশঃ)

উপনিষদ কী ও কেন

শ্রীসুনীল রাহা

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রশ্ন উপনিষদ—তৃতীয় প্রশ্ন

৩০শ (ত্রিংশ) শ্লোক—অথ হৈনং কৌসল্যশ্চাশ্বলায়নঃ পপ্রচ্ছ—ভগবন্, কুত এষ প্রাণো জায়তে কথমায়াত্যস্মিঞ্ছরীর, আত্মানং বা প্রবিভজ্য কথং প্রাতিষ্ঠতে কেনোৎক্রমতে কথং বাহ্যমভিধত্তে কথমধ্যাত্মম্ ? ইতি ॥ ১

৩১শ শ্লোক—তস্মৈ স হোবাচ—অতিপ্রশ্নান্ পৃচ্ছসি, ব্রহ্মিষ্ঠোঽসীতি তস্মাত্তেঽহং ব্রবীমিতি ॥ ২

৩২শ শ্লোক—আত্মনঃ এষ প্রাণো জায়তে। যথৈষা পুরুষে ছায়া এতস্মিন্নেতদাততং মনোকৃতেনায়াত্যস্মিন্ শরীরে ॥৩

৩৩শ শ্লোক—যথা সম্রাড়েবাধিকৃতান্ বিনিযুঙ্‌ক্তে—এতান্ গ্রামান্ এতান্ গ্রামানধিতিষ্ঠস্বেতি—এবমেবৈষ প্রাণ ইতরান্, প্রাণান্ পৃথক্ পৃথগেব সন্নিধত্তে ॥৪

৩৪শ শ্লোক—পায়ূপস্থেঽপানং চক্ষুঃশ্রোত্রে মুখনাসিকাভ্যাং প্রাণঃ স্বয়ং প্রাতিষ্ঠতে, মধ্যে তু সমানঃ, এষঃ হি এতৎ হুতম্ অন্নম্ সমং নয়তি। তস্মাদেতাঃ সপ্তার্চিষো ভবন্তি ॥৫

৩৫শ শ্লোক—হৃদিহ্যেষঃ আত্মা অত্রৈতদেকশতং নাড়ীনাং তাসাং শতং শতমেকৈকস্যাঃ দ্বাসপ্ততিৰ্দ্বাসপ্ততিঃ প্রতিশাখানাড়ীসহস্রাণি ভবন্তি, আস্বব্যানশ্চরতি ॥৬

৩৬শ শ্লোক—অথৈকয়োর্ধ্ব উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপম্ উভাভ্যামেব মনুষ্যলোকম্ ॥৭

সরলার্থ

৩০ (ত্রিংশ) শ্লোক—তারপর অশ্বল পুত্র কৌসল্য পিপ্পলাদ-ঋষিকে জিগ্যেস করেন—'ভগবন্, প্রাণ কোথা হতে জন্মলাভ করে ? এই শরীরে কী প্রকারে প্রবেশ করে ? নিজেকে বিভক্ত করে কি প্রকারেই বা এই দেহের মধ্যে অবস্থান করে ? কিরূপে কোন বৃত্তি দ্বারা এই দেহ হতে বেরিয়ে আসে ? কি প্রকারে বাহ্য বিষয়কে (অধিভূত ও অধিদৈব) ধারণ করে ? আবার কি প্রকারে অধ্যাত্ম বিষয়কে (দেহ ইন্দ্রিয়াদি) ধারণ করে ?

পূর্বের প্রশ্নের উত্তরে বলা হয়েছিল যে প্রাণই এই শরীরকে ধরে ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করে থাকে। পূর্ব প্রশ্নের উত্তরেই এখন বলা হল, প্রাণ কোথা হতে উৎপত্তি হচ্ছে এবং কী করে নিজেকে বিভক্ত করে দেহে প্রবেশ করেছে আবার সেই থেকে কি ভাবে বেরিয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি জানতে চেয়ে কৌসল্য (শিষ্য) ঋষির কাছে নিবেদন করেছে।

৩১শ শ্লোক—পিপ্পলাদ ঋষি বললেন, তুমি অতি কঠিন প্রশ্ন করেছ কৌসল্য। যেহেতু তুমি ব্রহ্ম পরায়ণ (অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ বা ব্রহ্মজিজ্ঞাসু) সেজন্য তোমার এই প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি।

৩২শ শ্লোক—পরমাত্মা বা পরমপুরুষ হতে এই প্রাণ জন্মলাভ করে থাকে। ছায়া যেমন মানুষের শরীরকে আশ্রয় করে থাকে, সেইরূপ এই প্রাণও আত্মাতেই আশ্রিত আছে আর মনের

সংকল্প দ্বারাই প্রাণ শরীরে প্রকাশ হয়ে থাকে। যাহার মনের সংকল্প যেরূপ সে সেই রূপ দেহ পেয়ে থাকে। সাধারণতঃ মরণকালে মনের সংকল্প বা অবস্থা অনুসারে এই দেহ প্রাপ্তি ঘটে. কিন্তু মৃত্যুকালীন মনের সংকল্প আবার সমস্ত জীবন ব্যাপী মানসিক অবস্থার উপর নির্ভর করে।

৩৩শ শ্লোক—সম্রাট অর্থাৎ ক্ষমতাশালী যে রাজা তিনি যেমন তাঁর অধীনস্থ সামন্তবর্গকে বিভিন্ন প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন ও বিবিধ কার্যের ভার তাদের উপর অর্পণ করেন, মুখ্য প্রাণও সেইরূপ তার অধীনস্থ পাঁচটি প্রাণ বায়ু এবং ইন্দ্রিয়গণকে দেহের বিভিন্ন অংশে স্থাপন করে বিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত করেছেন। মুখ্য প্রাণই যেন সম্রাট স্থানীয়। এ ছাড়া যে পাঁচটি প্রাণবায়ু প্রাণের অধীনে আছে, তাদেরও একটির নাম প্রাণ। (এই পাঁচটি প্রাণ বায়ুর নাম—প্রাণ, অপান, উদান, ব্যান ও সমান)

৩৪শ শ্লোক—এই মুখ্যপ্রাণ অপান বায়ুকে মলদ্বারে ও জনন-ইন্দ্রিয়তে নিযুক্ত করেন আর প্রাণ স্বয়ং মুখে ও নাসিকায় বিচরণপূর্বক (শ্বাস-প্রশ্বাস রূপে) চক্ষু ও কর্ণে অবস্থান করেন। প্রাণ ও অপানের মধ্যভাগে (নাভিদেশে) সমান বায়ু অবস্থিত। এই সমান বায়ুই জঠরাগ্নিতে আহুতিরূপে ভুক্ত অন্নকে সমতাপ্রাপ্ত করায় এবং তাহা দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যকে জীর্ণ করে দেহের সাথে সমতা প্রাপ্ত করায় অর্থাৎ জঠরাগ্নিতে আহুতিরূপে প্রদত্ত ভুক্তদ্রব্যকে জীর্ণ করে দেহের মধ্যে রস-রক্তাদিতে পরিণত করে শরীরের পুষ্টি সম্পাদন করে। ঐ জঠরাগ্নি হৃদয়-প্রদেশে গেলে সেই উত্তাপ হতে সাত প্রকারের শিখা বা দীপ্তি উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এই সাতটি দীপ্তি সমস্ত প্রাণের ক্রিয়া হতে উৎপন্ন; বিশেষতঃ সমান বায়ু দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য জীর্ণ হলে দেহের পুষ্টি এবং ইন্দ্রিয়গণের ক্রিয়া ও পোষণ হয়ে থাকে।

৩৫শ শ্লোক—হৃদয়াকাশেই আত্মা বাস করেন। এই হৃদয়ে ১০১ একশো একটি নাড়ী আছে। আবার এই সকল নাড়ীর এক একটিতে একশত করে শাখা নাড়ী আছে; প্রত্যেক শাখা নাড়ী আবার ৭২ হাজার প্রশাখাতে বিভক্ত। এই সকল নাড়ী এবং উহাদের শাখা - প্রশাখাতে ব্যান-বায়ু বিচরণ করে।

ব্যাখ্যা—হৃদয়-পুণ্ডরীকই আত্মার স্থান। যোগী সাধকগণ হৃদয়াকাশে জ্যোতিরূপে আত্মাকে দর্শন করেন। এই হৃদাকাশ হতে উদ্ভুত হয়ে বহুসংখ্যক নাড়ী এবং শাখানাড়ী শরীরের সর্বত্র ব্যাপ্ত আছে। ব্যান - বায়ু এই সকল নাড়ীতে বিচরণ করে থাকে। শরীরের সন্ধি-স্থান, স্কন্ধদেশ ও মর্মস্থানের সন্ধিস্থলে এই ব্যান বায়ুর অধিষ্ঠান। এই বায়ুর কাজ হল, দেহের সর্ব্বত্র রক্ত সঞ্চালন, স্নায়বিক শক্তির সঞ্চারণ এবং বীর্যসাধ্য কর্মসম্পাদন অর্থাৎ দেহের পেশী শক্তির সঞ্চালন।

৩৬শ শ্লোক—আর একটি নাড়ী (সুষুম্না নাড়ী) দ্বারা উর্ধগামী হয়ে উদানবায়ু পুণ্যকর্ম্মের ফলে জীবকে পুণ্যলোক, জীবের পাপকর্মের ফলে পাপলোক এবং পাপ-পুণ্য উভয় সমান-ভাবে প্রধান হলে মনুষ্যলোক (মর্তলোক) প্রাপ্ত করায়।

ব্যাখ্যা—এস্থলে উদানবায়ুর অধিষ্ঠান ও কার্যের কথা বলা হয়েছে। জীবগণ মৃত্যুর পর পার্থিব লোক হতে অপর লোকে গমন করে থাকে, সেই সেই সঞ্চারণ ক্রিয়া উদানবায়ু দ্বারাই সম্পন্ন হয়ে থাকে। উদানবায়ু সুষুম্না নাড়ী পথে উর্ধ্বগামী হয়ে জীবগণকে দেহ হতে নিষ্ক্রান্ত করে বিভিন্ন লোকে নিয়ে যায় যাঁরা পুণ্য-কর্ম-পরায়ণ তাঁহাদের স্বর্গাদি লোকে আর যারা পাপী, পাপকর্মে লিপ্ত তাহাদের নরকাদি লোকে অথবা পশুপাখি ইত্যাদি তির্যক যোনিতে, আর পাপ-পুণ্য কর্মের সমভাবে অনুষ্ঠাতা যারা তাদের মনুষ্যলোকে অর্থাৎ মর্ত্যলোকে নিয়ে যায়।

(ক্রমশঃ)

আনন্দ যাত্রা

শ্রীমতী গোপা গুপ্ত

প্রতি বছরের মতো এ বছরও আমাদের শিমূলতলা যাওয়ার কথাবার্তা অক্টোবর মাসে শুরু হ'য়ে গেল। যারা যাবে তাদের টিকিটের বন্দোবস্ত করতে হবে এ মাসেই। এই ব্যাপারে সুনুদিই সব ব্যবস্থা ক'রে থাকে। এ বছরেও তাই হ'লো। কে কে যাবে জেনে টিকিট কাটতে দেওয়া হ'লো। দীপ্তিদির যাওয়া হবে কিনা তখনও ঠিক নেই। অনেকদিন আগে থেকেই দীপ্তিদি সাধুবাবা সাধুমার চরণে প্রার্থনা জানাচ্ছে যে সবাই যেন একসঙ্গে যেতে পারে। কিন্তু পারিবারিক কিছু কারণে শেষ পর্যন্ত যাওয়া হ'য়ে উঠলো না।

যাওয়ার বেশ কিছুদিন আগেই আশ্রমে সমবেত হ'য়ে কি কি নেওয়া হবে, কে কি নেবে ইত্যাদি আলোচনা ক'রে স্থির করা হ'লো। অন্যান্য বছরের মতো এ বছরেও পুরোনো জামা-কাপড় নেওয়া হবে, কিন্তু তার সংখ্যা অনেক হওয়ায় প্রায় পনেরো বস্তায় তা বস্তাবন্দী করতে হ'লো। এতগুলো বস্তা কিভাবে ট্রেনে নেওয়া হ'বে, সেই কথা ভেবে বাবলিকে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকতে বলা হলো।

অনেকদিনের অপেক্ষার শেষ ক'রে ২৩শে ডিসেম্বর, সাধুবাবা-সাধুমাকে প্রণাম ক'রে সকাল ৮-১৫ মিনিটে বাড়ীর থেকে বেরিয়ে সময়মত ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। গিয়ে দেখি ভানুদি আর অরুণদা আগেই পৌঁছে গেছেন। সবাই একে একে আসতে লাগলো। পূর্ব নির্দেশ মতো নিখিল এবং বাবলিও ষ্টেশনে হাজির। একটা ট্রলিতে বস্তা বোঝাই করে বাবলি, পাপ্পু, সুকুমার রা ধরাধরি করে বস্তাগুলো ট্রেনে তুলে দিল।

সকাল ৯-৫০ মিনিটে আমাদের ট্রেন উদয়ন-আভা তুফান এক্সপ্রেস ছাড়লো। আমরা সাধুবাবা সাধুমার জয়গান করে যাত্রা শুরু করলাম। সবাই ঠিকমতো গুছিয়ে বসার পর সুনুদি এবার খাবার দাবার গুলো বার করতে বললো। রমা, মমতা, আমি ও আরও কয়েকজন মিলে পুরি, তরকারী, মিষ্টি কাগজের প্লেটে সাজিয়ে সবাইকে খেতে দিলাম। তারপর চা খাওয়া হ'লো। ট্রেন তখন গতি বাড়িয়েছে। আমাদের মনের মধ্যে তখন শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। অনেক কথা, অনেক গল্প চ'লছে। এবার ভক্ত সংখ্যাও অনেক, সেই কারণে সবাই একসঙ্গে বসা সম্ভব হয়নি। এদিক

ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসা হ'য়েছে। সময় গড়িয়ে চলেছে। ১টা নাগাদ দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা শুরু হ'লো—রুটি, আলু চচ্চড়ি আর মিষ্টি। পরে এক ভাঁড় করে গরম চা। সময় যে কোন দিক দিয়ে ব'য়ে চলেছে বোঝা যাচ্ছে না। ট্রেন বেশ ভালো গতিতেই যাচ্ছে। এক সময় দেখি মধুপুর ষ্টেশনে গাড়ী দাঁড়িয়েছে। বুঝলাম আমাদের পৌঁছতে খুব বেশী দেরী নেই। শিমূলতলার আগের ষ্টেশন থেকেই আমাদের সঙ্গে আনা জিনিষগুলো ট্রেনের দরজার কাছে রাখা হচ্ছে। ট্রেন এখানে বেশীক্ষণ থামে না অথচ সঙ্গে এতো জিনিষ। ট্রেন শিমূলতলা পৌঁছতেই সঙ্গে সঙ্গে অরুণদা, পাপ্পু, সুকুমার সবাই মিলে বস্তাগুলো ট্রেন থেকে প্ল্যাটফর্মে নামাতে লাগলো। সময় তখন ৪-৩৫ মিঃ। ট্রেন থেকে নেমে দেখি বিষ্ণু, শুকদেব, তেনুয়া আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। আমাদের কুশল প্রশ্ন ক'রে হাতের ব্যাগগুলো ওরাই নিয়ে নিলো। আমরা ধীরে ধীরে আশ্রমের দিকে এগোতে লাগলাম। তখনও সূর্য্য অস্ত যায়নি। চারিদিক পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। ষ্টেশন চত্বর পেরিয়ে রাস্তায় পা দিয়ে দেখি রাস্তাটা খুব ভালো করা হ'য়েছে। রমাও তার উল্লেখ করলো। যাইহোক আমরা সেই চেনা রাস্তা ধরে আশ্রমে পৌঁছে গেলাম।

চওড়া সিঁড়ির দু'পাশের বিশাল শিউলি গাছ দুটো যেন তাদের শাখাপ্রশাখা মেলে আমাদের আহ্বান জানাচ্ছে। মন্দিরে গিয়ে বাবা মাকে প্রণাম করে বললাম তোমাদের অপার করুণা তাই সকলের সঙ্গে আমায়ও এত আনন্দের সামিল ক'রেছো। বাইরে বেরিয়ে আসার কিছুক্ষণ পর বিষ্ণু শুকদেব আমাদের চা-বিস্কুট দিল। আমরাও যে যার হাত মুখ ধুয়ে চা-বিস্কুট খেলাম। মনে এত আনন্দ যে সারাদিনের ট্রেন 'জার্নি'র কোন ক্লান্তিই শরীরে নেই। স্থান-মাহাত্ম্য তো র'য়েইছে। সন্ধ্যে হতেই জেনারেটর চালানো হ'লো। সব ঘরে-ঘরে, হলে আলো জ্বলে উঠলো। বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখি যতদূর দেখা যায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠাণ্ডা যে খুব বেশী তা নয়—কোলকাতার থেকে একটু বেশী। রমার কোলকাতায় 'ফোন' করার ছিল। আমায় সঙ্গে যেতে বলাতে আমি রাজি হতেই জয়ীও যাবার জন্যে তৈরী হ'য়ে গেল। শুকদেব বাজার যাচ্ছিলো। একটা টর্চ নিয়ে আমরাও ওর সঙ্গে চললাম। জয়ীকে রমা আর আমার মাঝে নিয়ে হাঁটতে লাগলাম। শুকদেব টর্চ জ্বেলে আগে আগে চলেছে। বাজারে গিয়ে দেখি দোকানের আলোয় জায়গাটা ঝলমলে, বাজারও বেশ জমজমাট। আমরা ফোন করে আশ্রমে ফিরলাম। সঙ্গে সেই শুকদেব। আশ্রমে এসে ঠাকুর ঘরে পাতা মাদুরে বসলাম। গৌরাঙ্গদা তখন গান গাইছেন। তবে ওনার শরীরটা ভালো না থাকায় খুবই নীচু স্বরে, ধীরে ধীরে গান ক'রে উঠে গেলেন। সেখানে কিছুক্ষণ থেকে প্রণাম ক'রে হলে চলে এসে গল্প করতে লাগলাম। ওদিকে বিষ্ণুরা তখন রান্নার ব্যবস্থা করতে লাগলো। ৯টা নাগাদ আমাদের খাওয়ার ডাক পড়লো। গরম গরম ভাত, মুগের ডাল, আলুসেদ্ধ আর বাঁধাকপির তরকারি খুব তৃপ্তি করে খেলাম। রাত ১০টা নাগাদ জেনারেটর বন্ধ করে দেওয়া হবে তাই তার আগে আমরা ১০/১২ জন হলে শুয়ে পড়লাম। শুয়ে একটু গল্প করার পর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

পরের দিন ২৪শে ডিসেম্বর ঘুম থেকে উঠে বসেই হাতে গরম চা আর বিস্কুট। মায়ের মেয়েরা সব বাপের বাড়ী এসেছে তো তাই মায়েরই এই ব্যবস্থা। একটু বেলা হতে সবাই লুচি, আলুর চচ্চড়ি আর মিষ্টি খেয়ে, স্নান সেরে মন্দিরে ঢুকলাম। রমা, মমতা, জয়ী, পাপ্পু, কল্যাণী, মণিকারা অটো নিয়ে গেল সহস্রধারা বলে একটা গ্রামের দিকে— উদ্দেশ্য সোয়েটার, কাপড় ইত্যাদি বিতরণ করা। সুনুদি আর আমি মন্দিরে বাবা-মার মূর্ত্তি, বেদী মুছে পরিষ্কার করে, কাপড় পরিয়ে এলাম ঠাকুর ঘরে। সাধুমার খাটের বিছানা-পত্র ডলি আর আমি রোদে দিয়ে যত ঠাকুরের মূর্তি ও পেতলের ফুলদানি ইত্যাদি পরিষ্কার করে গুছিয়ে রাখলাম। পরের দিনই তো উৎসব বেলা প্রায় ১-৩০ মিঃ নাগাদ আমরা সবাই খেতে বসলাম। গরম ভাত, ডাল, বেগুন ভাজা, আলু-কপি দিয়ে মাছের ঝোল আর শেষ পাতে চাট্‌নি খুব তৃপ্তি করে খাওয়া গেলো। উঠোনে চৌকি পাতা ছিল; সেখানে গিয়ে অনেকেই বসলো। গল্পগুজবে কখন যে বেলা পড়ে এসেছে টেরই পাইনি। দেখি বিষ্ণু আর শুকদেব চা নিয়ে এসে হাজির। চা খেয়ে সবাই ভেতরে চলে এলাম কারণ সূর্য্য অস্ত যেতে যেতেই বাইরেটা বেশ ঠাণ্ডা মনে হলো। সন্ধ্যেবেলা মন্দিরে প্রণাম করে ঠাকুর ঘরে গেলাম। কিছুক্ষণ বসে হলে চলে এলাম। পরের দিন উৎসব কিন্তু তার মধ্যেই আমাদের ওখানে যারা কাজ করছে তাদের ও তাদের বৌ-বাচ্চা সবার জন্য কোলকাতা থেকে নিয়ে যাওয়া শাড়ী, সোয়েটার, জামাকাপড় দেওয়া হলো। রাত ৯টা নাগাদ খাওয়ার ডাক পড়লো। ভোর ভোর উঠতে হবে তাই আজকে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়া। শুয়ে অনেকক্ষণ অবশ্য গল্প চললো। তারপর এক ঘুমে ভোর।

আজ ২৫শে ডিসেম্বর। উৎসবের দিন। এই দিনটার জন্যেই তো এখানে আসা। চা খেয়ে স্নান সেরে নিলাম। পাঁচিপিসির কথামত রমা, টুটুন, লীনুদি, ডলি, মাষ্টারজীর স্ত্রী মন্দিরের লাগোয়া জায়গায় বসে ফল কাটতে বসলাম। সুনুদি মন্দিরের জানলা, দরজা গাঁদা ফুলের মালা দিয়ে সাজাতে লাগলো। ফুলদানিতে গোলাপ সাজিয়ে বেদীতে দিলো। আর টবে মাটি দিয়ে তাতে নানা রঙের গ্লাডিওলাস্ ফুল পুঁতে এতো সুন্দর করে সাজিয়ে দিলো যে আমরা সবাই একেবারে মোহিত হয়ে গেলাম। সত্যি সত্যিই অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো। চন্দন বেটে, বেলপাতা আর জবা ফুল দিয়ে মাকালীর জন্যে মালা গাঁথলাম। এবার ঠাকুর মশাই এলেন এবং পুজো শুরু হ'লো। ধুপ, ধুনো, ফুল, চন্দনের গন্ধ আর স্তোত্রপাঠে পরিবেশটাই আনন্দময় হ'য়ে উঠলো। মনে মনে বাবা-মার চরণে শতকোটি প্রণাম জানিয়ে আমার মতো এক অকিঞ্চনকে এত কৃপা করার জন্যে অন্তরের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করলাম। কি জানি কেন দীপ্তিদির কথা বারবার মনে হচ্ছিল। মনে কষ্টও অনুভব করলাম। পুজো শেষে যজ্ঞ শুরু হলো। শেষ হতে কিছুটা সময় লাগলো। বাইরের মাঠে তখন ফল, খিচুড়ি, লাবড়া, চাটনি, পায়েস ও বোঁদে বিতরণ শুরু হয়েছে—নরনারায়ণ সেবা চলছে। বেলা ৩-৩০ মিঃ নাগাদ আমরাও মাঠে প্রসাদ পাবার জন্যে গেলাম; তখনও প্রচুর ভীড়। অন্যবারের মতো এবার কিন্তু বেশ কিছু লোককে খাবার পর পাতা তুলে নিতে দেখলাম না। সুনুদি

নিজেই কয়েকটা পাতা তুলে আমাদের বসার জায়গা করে নিজেও খেতে বসলো। খাওয়ার পর আমরা একটু বিশ্রাম নিলাম। এখানে একটা কথা বলে রাখি যে আজ ভোরে মমতা ও আরও কয়েকজন গ্রামে গিয়ে জামাকাপড় ইত্যাদি বিতরণ করেছে। সন্ধ্যেবেলার সভায় সবাই সমবেত হলো। ধর্মীয় আলোচনা ও গানে হলঘর মুখরিত হয়ে গেল। গানে অর্দ্ধেন্দুদা, মেখলাদি, বুলান, মাষ্টারজীর স্ত্রী আর আমি অংশ নিলাম। শেষে জয়শ্রীদির পরিচালনায় হলো দুর্গানাম। এবার সবাইকে প্রসাদ বিতরণ করা হলো। রোজকার মতো রাতে খাওয়া সেরে সবাই শুয়ে পড়লাম।

আজ ২৬শে ডিসেম্বর। কোন তাড়া নেই। সকাল বেলায় পিসি, সুন্মদি, রমা আর আমি অটোয় চড়ে গেলাম স্থানীয় এক ভদ্রলোকের বাড়ী। সঙ্গে আশ্রমের (কোলকাতার) তরফে দেওয়া নতুন শাড়ী। ভদ্রলোক গ্রামের কিছু দুঃস্থ মহিলাদের আসতে বলেছিলেন। তাদের দেওয়া হলো নতুন শাড়ী। পেয়ে তো তারা দারুণ খুশি। ভদ্রলোকের গাছের শখ। তাঁর বাগান দেখে, বাড়ীতে চা খেয়ে আমরা সেই অটো চড়েই আশ্রমে ফিরলাম। ফিরে দেখি অসংখ্য জনসমাগম। আজ জামাকাপড় বিতরণ হবে। তাই এতো ভীড়। ভীড় সামলাতে পুলিশের সাহায্য নিতে হলো। স্নান, খাওয়া সেরে রমা, ডলি আর আমি গেলাম একটু ঘুরে আসতে। বেড়িয়ে ফিরে আসার সময় দেখি একটা গাছের নীচে অনেক চালতা পড়ে রয়েছে। ওপরে তাকিয়ে দেখি যে গাছে প্রচুর চালতা ঝুলছে। আমরা তিনজনেই চালতাগুলো জড়ো করে ভাবলাম কি করে আশ্রমে নিয়ে যাবো। ঠিক হলো রমার চাদরটা কালো তাই সেটাতে ১৬টা চালতা নিয়ে দুদিক ধরে আশ্রমে নিয়ে আসা গেলো। চালতা দেখে কয়েকজন ১/২টো চালতা নিলো। যা ছিলো সব কোলকাতার আশ্রমের জন্যে রেখে দেওয়া হলো। চা দেওয়া হয়েছে, তা খেতে খেতে আর চালতা পাওয়ার গল্প করতে করতেই অনেক সময় চলে গেলো।

আজ ২৭শে ডিসেম্বর। আমাদের ফেরার পালা। ঘুম থেকে উঠে যথারীতি চা খেয়ে স্নান সেরে কোলকাতায় যারা ফিরে যাবে তারা নিজেদের জিনিসপত্র গুছোতে লাগলাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া করে নেওয়া হলো। আশ্রম থেকেই ট্রেনে রাতে খাবার জন্যে রুটি তরকারীর ব্যবস্থা করা হয়েছে। সঙ্গে মিষ্টি নেওয়া হলো। মন্দিরে গিয়ে বাবা-মাকে প্রণাম জানিয়ে সবার মঙ্গলকামনা করে বেলা ১২.৩০ মিনিট নাগাদ ষ্টেশনের উদ্দেশে বেরোলাম। সেখানে পৌঁছে শুনি ট্রেন অনেক 'লেট'। আমরা আর কি করি? সময় কাটাতে হবে। তাই চিনেবাদামওয়ালার থেকে নেওয়া হলো বাদাম, তারপর খাওয়া হলো কাঁচাছোলা আর ঘুগনি। সঙ্গে চা তো আছেই। গল্পগুজব চলছে কিন্তু ট্রেনের আর দেখা নেই। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। সোনার থালার মতো সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে পড়ছে দেখে মেখলাদি গান গেয়ে উঠলো। আমাদের মন গানের সুরে ভরে গেলো। সন্ধ্যে ৬টা নাগাদ ট্রেন আসার খবর ঘোষণা করায় আমরা তৎপর হয়ে উঠলাম। ট্রেন আসতে সবাই উঠে ঠিকঠাক বসে পড়লো। মেখলাদি নানা মজার কথা বলে সবাই-এর মনোরঞ্জন করতে লাগলো। আমাদের ট্রেন খশিডি পৌঁছতে দেখি সুন্মদি, মমতা,

ভানুদি, অরুণদারা বেনারস যাবার ট্রেন ধরার জন্যে অপেক্ষারত। আমাদের দেখেই সুনুদি সঙ্গে সঙ্গে ষ্টেশনের ষ্টল থেকে চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করে ফেললো। সুনুদির এই আন্তরিকতায় আমরা মুগ্ধ হলাম। বলাই বাহুল্য যে সুনুদির কাছ থেকে এমন আন্তরিকতা আমরা আশ্রমে পেয়েই থাকি। আগেই বলেছি যে ট্রেন বেশ 'লেট' ছিলো। তাই হাওড়া পৌঁছলাম রাত ১টা ৫ মিনিটে। সেখান থেকে চুমকী আর অলিপ্রিয়াকে নিয়ে সল্টলেকের বাড়ীতে তাদের পৌঁছে যখন বাড়ী ফিরলাম তখন ঘড়িতে রাত ১.৪০ মিনিটে। এবারের শিমূলতলা যাত্রার এখানেই পরিসমাপ্তি।

Worship or "Puja"

by

Dr. A. K. Bandyopadhyay

"Worship" or "Puja" means 'reverent love and allegiance accorded to a deity, idol or sacred object. It relates to a set of religious forms, as ceremonies and prayers by which the reverent love is expressed. It is a matter of honouring and loving an object as a deity. The act of worship is a part of ritual in religion. For every religion, though forms may vary, they have certain religious principles, holy books like the Bible or the Koran, and certain rules and rituals like prostration or standing up. Such material worship gets transformed into spiritual worship. There are different forms of worship—it may be worshiping tree, stone or earthen or stone images. But basically the worship is of the spirit which, it was believed, regulated our lives. Most of these are low states of worship because many of us do not have spiritual education and everything in prayer or "Puja" centres on human terms. Even in such worship of formal kind there is worship of images, ancestors and finally of God. In a higher order of formal worship there is symbol worship i.e. symbols of circles, squares, cross, "Swastika" etc.

Symbolic form of worship comprises worship of the symbol of cross or crescent or pictures or paintings. Worship through music has also been prevalent. There are always some prayers in "Pujas" and generally material prosperity and things are prayed for. Swami Vivekananda has called such worship in religion as "shopkeeping worship" Nevertheless, in all such worship or "Puja" there is concentration or disciplining of the mind and, in course of time, this leads to learning and knowledge. What Vivekananda emphasised was practice of "man-making religion" that is, making of a person

with true realisation and full perceiving of the infinite presence of God in his heart and realisation of oneness of mankind. Vivekananda has observed that formal worship is' "a low state of worship" because it means petitioning God as a means to the end, i.e. pelf and prosperity in this life and in this world. Nevertheless, to pray for something is better than nothing. Gradually, the mind would begin to think of something higher than the senses, the body and the enjoyments of good thing in the world. Gradually, through worship a man becomes a thinker, and then he concentrates on his thoughts and then you learn to watch on senses. You then come to a direct perception of something higher than the body. The mind then thinks of a goal in life. You develop a glimpse of your spirit and then your senses and sense-enjoyments will all melt away from you. Glimpses and glimpses will come from the realm of spirit. You will understand what "Yoga" is. God will then be worshipped as a spirit. You will come to realise that the purpose of worship is not to gain something. You will then say that you do not want wealth, beauty and not even learning. You will not even want salvation. You will realise that God is Love which is pure and unselfish. God will become your beloved as the Vaisnavas believe.

বংশী-ধ্বনি

কবিরত্ন শ্রীসুধীর গুপ্ত
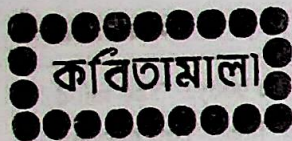
—১— বাঁশী তাহার শোনার আগে
যা' খুশি যে ক'রে বেড়ায়.
শুনলে বাঁশী মর্ম - মাঝে
সুর - ধ্বনি পশে যে তায়
সব সময়ে বংশীধরের
কথা-ই মনে প'ড়ে যে যায়।

—২— চেনার অধিক চেনা যে হয়
সুরের তরেই মুরলীধর,
সুরানুরাগ জাগলে তা' যে
আবেগ তোলে বুকের ভিতর,
পাগল করে দেখার তরে—
আচমকা হয় সে চিত্ত-হর!

—৩— বংশী - রব যে গরব ভুলায়—
দাসানুদাস হওয়ার লাগি'
দাস্য প্রেমে প্রকাশ্যেই
ক'রে তোলে অনুরাগী,
চির - সাথী থাকার তরে
অনুমতি লয় যে মাগি'।

—৪— ভব - ব্রজে দ্বাপর - লীলা
অজস্র - বার হ'তেই থাকে,
মুরলী - রব শ্রোতারে যে
দীপ্ত - তৃপ্ত সদা-ই রাখে,
সুরের মাঝে সুরাতীতের
ধ্বনির—ধুয়ার রস-ই চাখে।

—৫— অগোচর যা' রয় তাহা-ও
অকস্মাৎ-ই গোচর যে হয়,
মনোহরের মধুর লীলা
কোন ভাবেই ভোলার যে নয়,
বিস্ময়ের যে অবধি নাই—
মধুর মর্ত্য আনন্দময়,
ধ্বনির ধুয়া-ই ব্যঞ্জনাতে
কথার অতীত কথা যে কয়।

"এস মা বিদ্যাবতী"

যূথিকা সিন্‌হা

এস মাগো সরস্বতী
শুভ্র বসনা
এস মাগো জ্ঞানদাত্রী
হংস বাহনা
আবাহন করি মাগো
এস এ মহীতে
গৃহে গৃহে তব পূজা
ভক্তি নম্র চিতে

গলায় শোভিছে মাগো
মুকুতার হার
কিবা শোভা হইয়াছে
কত মনোহর
বীণা খানি লয়ে হাতে
এস বীণাপাণি
নূপুর পরানো তব
চরণ দুখানি

অলক্ত রঞ্জিত পদে
এস মা ভারতী
তোমার চরণে যেন
সদা থাকে মতি
বিদ্যা বুদ্ধি দাও মাগো
জ্ঞান দাও মোরে
তব শ্রীচরণ যেন
সদা রহে শিরে ॥

স্মরণ

অগ্নিমিত্র চৌধুরী

তোমার স্মরণে মনে পড়ে যায়
শত ছোট সুখে মন ভরালে।
ক্ষুদ্র 'আমি' কে ক্ষণিক ভুলিয়ে
বিশ্ব-দুয়ারে রাখিলে।
কত দুঃখ হয়ে মরমে বিঁধেছ;
অলীক স্বপন নিদয়ে ভেঙেছ;
তবুও বিপদে মরমী দরদে
বরাভয় হাতে বাঁচালে।
বিশ্ব মেলায় নতুন খেলায়
মায়াজাল মেলে জড়ালে॥

মায়ের কথা

ডঃ অভিনব গুপ্ত

তুমি বড়োই একচোখো মা, —
যদিও তুমি মনোরমা।

যার উপরে নজর পড়ে, তারে দাও সব উজাড় করে;
বাকী বাঁধো মায়ার ডোরে; পায় না—তোমার সান্ত্বনা।

পূজে তোমায় সর্ব জনে,—জগত-জননী ভণে।
শুনেও শোনো না কানে সব সন্তানের আরাধনা।

গর্ভধারিণী মা যে আমার, সব সন্তানে ভালোবাসে।
নিক্তি ধরে স্নেহ বিলায়, কভু না হয় একপেশে।
যাদের তুমি মা করেছো, মায়ের গুণ সব শিখায়েছো;
শিখিয়ে নিজে ভুলে আছো। থাকো সদা অন্যমনা।

এসব দেখে লাগে ধন্ধ। তোমার ধরণ-ধারণ রেজায় মন্দ।
তবু যবে চোখ রাখি বন্ধ, চরণ থেকে মন সরে না।

॥ গল্পে বীরবল ॥

শ্রীউৎপল সেনগুপ্ত, (সাহিত্যভারতী)

॥ বাপ্‌কা বেটী ॥

বীরবলের মেয়ের উপস্থিত বুদ্ধিও নেহাৎ কম নয়। বাপের অনেক সমস্যার সমাধান মেয়ে করে দিয়েছে।

একদিন বাদশা বীরবলকে ডেকে বললেন—বীরবল, আমাকে এমন একটা বর্ম তৈরী করে দাও, যার উপর অস্ত্রের আঘাত হানলেও অটুট থাকবে।

বাদশার আদেশমত বীরবল দেশের নামকরা কারিগরকে দিয়ে বর্ম তৈরী করিয়ে বাদশার সামনে এনে রাখল।

আকবর বর্মটি পরীক্ষা করার জন্য মাটির উপর রেখে অস্ত্র দিয়ে বার বার আঘাত করতে লাগলেন। কয়েকবার আঘাতেই বর্মটি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বাদশা বীরবলের দিকে তাকিয়ে তাচ্ছল্যের হাসি হাসলেন

বীরবল কোন কথা না বলে মাথা নীচু করে সভাকক্ষ ত্যাগ করলো। তারপর বাড়ী এসে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলো।

বাবাকে বিশেষ চিন্তিত দেখে বীরবলের মেয়ে কাছে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো—"বাবা, এত গভীর ভাবে তুমি কি চিন্তা করছ? বাদশা বুঝি কোন কঠিন কাজের ভার দিয়েছেন?"

হ্যাঁ মা। বীরবল দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—কি সে কাজ আমাকে একটু বল।

বীরবল সব কথা মেয়ের কাছে বললে, মেয়ে সামান্য হেসে বললে—এই কাজের জন্য তুমি এত ভাবছ কেন? তুমি এখন খেয়ে-দেয়ে বিশ্রাম কর। যা করবার আমি করবো। তবে তুমি ঐ রকম একটা বর্ম তৈরী করিয়ে আমার কাছে এনে দাও। সেটা নিয়ে আমিই যাবো বাদশার কাছে।

মেয়ের উপর বীরবলের যথেষ্ট আস্থা ছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষে বীরবল আর একটা বর্ম তৈরী করিয়ে এনে মেয়ের হাতে তুলে দিল।

পরদিন যথাসময়ে বীরবলের কন্যা দরবারে হাজির হয়ে বাদশাকে নমস্কার জানিয়ে বললে—জাঁহাপনা, আমি বীরবলের কন্যা। পিতার শরীর কিঞ্চিৎ অসুস্থ, তাই আমি নিজেই আপনার জন্য বর্ম নিয়ে এসেছি।

আকবর বললেন—বেশ ভাল, বর্মটি খুলে মাটিতে রাখ। আমি পরীক্ষা করে দেখবো।

বীরবল কন্যা মৃদু হেসে বললে—জাঁহাপনা, অপরাধ মার্জনা করবেন। বর্ম হলো যুদ্ধের সাজ। এই বর্ম মাথায় ধারণ করে বীর যোদ্ধাগণ যুদ্ধ করে এবং শত্রুর আঘাত থেকে রক্ষা পায়। সুতরাং মাথায় ধারণ করা অবস্থাতেই গুণাগুণ পরীক্ষা করা উচিত

বর্মটি আমি মাথায় ধারণ করেছি। এই অবস্থাতেই আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। যদি এই বর্ম আপনার আঘাত সহ্য করতে না পারে, তাহলে অবশ্যই নাকচ করে দেবেন।

বীরবল কন্যার যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে বাদশা বুঝতে পারলেন যে, তিনি মূর্খের মত কাজ করেছেন মনে মনে তিনি বিশেষ লজ্জিত হয়ে মেয়েটির কাছ থেকে বর্মটি চেয়ে নিলেন।

তারপর বীরবলের মেয়েকে পুরস্কার প্রদানের আদেশ দিলেন।

হারানো সাথী

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পরম ভক্ত সুধাকণ্ঠ কালিদাস গাঙ্গুলী ও শান্তি গাঙ্গুলীর দৌহিত্র, তাঁহাদের কন্যা কেয়া দাশগুপ্তের পুত্র অভীবীর দাশগুপ্ত বিগত ২৯-৯-২০০৮ তারিখে স্বীয় পত্নী ও একটি পুত্র সন্তান রাখিয়া অপরিণত বয়সে পরলোকগমন করিয়াছে। তাহার পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পরম ভক্ত প্রয়াত গোপাল চন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সুখেন্দু রায় বিগত ১৮-১০-২০০৮ তারিখে নবদ্বীপ ধামে ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। 'সজ্ঞসাথী' পত্রিকায় সুলেখক সুখেন্দু রায়ের বহু লেখা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'নবদ্বীপ ইতিবৃত্ত' সম্ভবতঃ উক্ত বিষয়ে প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ সমুচ্চয় যাহা ধারাবাহিক ভাবে উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার পরলোক গমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পরম ভক্ত যতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও বাণীভদ্রা রমা রায় চৌধুরীর পৌত্রবধূ, শ্রীযুক্ত ঋতেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও প্রয়াত গৌরী রায় চৌধুরীর পুত্রবধূ, শ্রীযুক্ত সৌমেন রায় চৌধুরীর সহধর্মিণী ভাস্বতী রায় চৌধুরী বিগত ২৮শে অক্টোবর, ২০০৮ মঙ্গলবার শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা দিবসে পরলোকগমন করিয়াছেন। বিদুষী ও গুণবতী ভাস্বতীর পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পরম ভক্ত ক্ষণপ্রভা গুহ বিগত ৭-১১-২০০৮ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা গভীর শোকপ্রকাশ করিতেছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের পরম ভক্ত সুধাকণ্ঠ কালিদাস গাঙ্গুলী ও শান্তি গাঙ্গুলীর কন্যা কেয়া দাশগুপ্ত বিগত ১৭-১১-২০০৮ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছি এবং শ্রীশ্রীসাধুবাবা ও শ্রীশ্রীসাধুমায়ের শ্রীচরণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করিতেছি।

মঠের সংবাদ

নয়াদিল্লী সত্যসঙ্ঘ—বিগত ১১ই জানুয়ারী রবিবাসরীয় সভা হয় সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীরঘু ব্যানার্জ্জীর বাসস্থানে। সভায় ভাষণ দেন, কলিকাতা সত্যসঙ্ঘের ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত। তিনি ধলঘাট, চট্টগ্রাম ভ্রমণের কথা বলেন এবং ভাষণে বলেন যে কলিতে নামই শ্রেষ্ঠ। সাধু বলেছেন সত্য কথা, বল, বুদ্ধদেবেরও শেষ কথা "সত্যের দীপকে জ্বালিয়ে রাখ।" সাধুবাবা বলছেন, ত্যাগ করুন, সাধুমা বলছেন যে, বাসনা বর্জ্জন করুন। অস্তিত্বকে সত্যময় করতে হবে। সাধুবাবা বলেছেন "চেষ্টা কর তাহলে আমি দেখব" মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও—এই আমাদের প্রার্থনা। ডঃ দাশগুপ্তের ভাষণের পর এক মনোজ্ঞ আলোচনায় আংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী সুতপা ভদ্র, শ্রীমতী লিলি সাইনি, শ্রীমতী দাশগুপ্ত এবং উপস্থিত সজ্জনমণ্ডলী। দুর্গানাম দিয়ে সভা শেষ হয়।

"The Sadhubaba Satya Sangha was held on January 11, 2009 in New Delhi as well as in Jakarta, Indonesia. The Sabha held in Jakarta started at 7 : 30 PM (6-00 PM Indian Standard Time). It started with a quiet prayer followed by bhakto Dr. Reshmi Banerjee Chakraborty singing eight bhajans. The Sabha ended with bhakto Dr. Reshmi & Arup singing together the Durga naam."

—Report sent by Mr. Arup Chakraborty

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা :—বিগত ৩১শে জানুয়ারী ২০০৯ শনিবার কলিকাতা শ্রীতারামঠে যথাবিহিত আড়ম্বর সহকারে শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা উদ্‌যাপিত হয়। পূজান্তে তারাচরণ অরণ্যকুমারী বিদ্যাপীঠের ছাত্র-ছাত্রীসহ সমবেত ভক্তবৃন্দ খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন।

সাধুবাবা শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের

ও

সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর

শ্রীচরণে শ্রদ্ধার্ঘ্য—

ডাঃ নারায়ণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ও

সরসীবালা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

পুণ্য স্মৃতিতে

নিবেদিত

নিবেদক

নয়াদিল্লী সত্যসঙ্ঘ

দূরভাষ :—

২৬৩৪৯৯৮৯, ৯৮১০১২৪৮৪১, ৯৮৯১৭২২৯১১, ৯৮১১০৯০৬৮৭

"মোর এই আশীর্বাদ ভুলি বাদ বিসম্বাদ।

সর্বজাতি মিলে যাক বিধির কৃপায়॥"

—শ্রীতারাচরণ

15th FEBRUARY—2009 REGISTERED SSRM/KOL.RMS/WB/RNP-190/2007-09

সজ্জনসাথী·মাঘ ১৪১৫

R. N. I. No. 2677/57

ভাবসিন্ধু ৺নির্ম্মল চন্দ্র বড়ুয়া রচিত—

১। সাধনার আলো (২য় সংস্করণ) ১০ টাকা
২। শ্রীশ্রী মা অরণ্যকুমারী (২য় সংস্করণ) ১০ টাকা
৩। অমৃত পরশ ৫ টাকা
৪। স্মরণ ৪ টাকা
৫। শ্রীপদ ছায়ায় ২০ টাকা
৬। প্রাণের ঠাকুর ২২ টাকা
৭। চিরসাথী হে অমৃতময় ১২ টাকা
৮। শ্রীশ্রীতারাচরণ কাব্যসম্ভার (আদি পর্ব) ১০ টাকা
৯। ঐ (মধ্য পর্ব) ১৬ টাকা
১০। স্মৃতির আলোয় সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী ২০ টাকা
১১। The Message of Sri Sri Sadhubaba Taracharan Paramahansa ১ টাকা
১২। অমোঘ আহ্বান ৫ টাকা

শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী দেবীর জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেবের জন্মশতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ ১০ টাকা

R. R. BANERJEA, B.Sc.
Sri Sri Sadhu Taracharan Paramahansadev— Rs. 10.00

প্রেমনিধি ৺উপেন্দ্রনাথ ঘটক রচিত—

শ্রীশ্রীমাতাজীর তীর্থ ভ্রমণ ৫.০০

৺অনিলবরণ চৌধুরী রচিত—

১। সাধুবাবা শ্রীতারাচরণ পরমহংস (৩য় সং) ১৫.০০
২। সাধুমা শ্রীশ্রীঅরণ্যকুমারী ৫.০০
৩। শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (গীতি আলেখ্য) ২.০০
৪। তুষার-তীর্থে (২য় সং) ১০.০০

৺বীরেন্দ্র নাথ ঘটক রচিত—

অমৃত লহরী (১ম খণ্ড) ৪.০০
ঐ (২য় খণ্ড) ৩.৫০

ব্রহ্মানন্দ ৺ব্রহ্মনাথ সুর রচিত—

দেব-সন্নিধানে (২য় সং) ১৫.০০

৺ব্রজেন্দ্র লাল কানুনগো প্রণীত—

সাধু তারাচরণ (২য় সং) ৫.০০

৺যামিনীকান্ত সেন প্রণীত—

সদ্গীতা (২য় সংস্করণ) ৫.০০

৺শচীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত প্রণীত—

সাধুবাবা শ্রীমৎ তারাচরণ পরমহংসদেবের জীবনী ও বাণী (দ্বিতীয় সং) ২.০০

৺কমলা দেবী বন্দোপাধ্যায় প্রণীত—

রত্নাবলী (২য় সংস্করণ) ১০.০০

শ্রীসুনীল রাহা রচিত—

সবার মা সাধুমা ১০.০০

Late DR. DINESH CHANDRA SEN, D.Sc., P.R.S.
Sadhubaba Sri Sri Taracharan Paramhansadev & Sadhuma Sri Sri Aranya Kumari Devi— Voluntary Donation Rs. 8/-

শ্রীশ্রীতারাচরণ পরমহংসদেব (হিন্দী)—শ্রীঅরদেব নারায়ণ সাহী মূল্য—দশ টাকা

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীতারামঠ, ৬এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬

শ্রীবিবরকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক তারাচরণ সত্যসঙ্ঘের পক্ষে 'সজ্জনসাথী মুদ্রণ', ৬বি, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সজ্জনসাথী কার্য্যালয় : ৬এ, সাধু তারাচরণ রোড, কলিকাতা-২৬ Tel. No.2464-2099
Mob : No. 9748955894